(দ্বিতীয় খণ্ড)

শৈলেশ ব্রহ্মচারী
(শিবানন্দ)

শোন বলি মায়ের কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

শৈলেশ ব্রহ্মচারী
(শিবানন্দ)

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি
৫৭।১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, ১৩৯১

মূল্য : সাত টাকা

মুদ্রাকর
শুভঙ্কর বসু
জে. জি. প্রিন্টার্স
১৮৯, শ্রী অরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আমার কিশোর বন্ধুরা !

"শোন বলি মায়ের কথা"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এ পুস্তকের প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশের পর থেকেই দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য তোমাদের অজস্র চিঠি আমি পেয়েছি, কিন্তু তোমাদের সে অনুরোধ এই দীর্ঘদিন রক্ষা করতে পারিনি সেজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। কারণ ইতিমধ্যে এমন কতগুলো ব্যাপার ঘটে গেছে যে এই দ্বিতীয় খণ্ড আদৌ প্রকাশিত হবে কিনা সে বিষয়েও শংকা দেখা দিয়াছিল। যাক করুণাময়ী মায়ের করুণায় সে দুর্ঘটনার মেঘ কেটে গিয়েছে। আজ এই খণ্ড তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি আর আশা করছি প্রথম খণ্ডের মতই এখণ্ডও তোমাদের কাছে প্রেম ও প্রীতি কুড়োবে।

তোমরা শুনে সুখী হবে ইতিমধ্যে প্রথম খণ্ড ভাষান্তরিত হয়ে গেছে।

ইতি
তোমাদের প্রীতিধন্য
গ্রন্থকার

শোন বলি মায়ের কথা

সেদিন ছিল ১৩৩৩ সনের বৈশাখ মাস। মা এসেছেন বৈদ্যনাথ ধামে। মায়ের সঙ্গে আছেন ভোলানাথ এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত। ঢাকার প্রাণগোপাল বাবুই মাকে নিয়ে এসেছেন। প্রাণগোপাল বাবু ছিলেন ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, ঢাকা, তা তো তোমাদের আগেই বলেছি। দেওঘরে প্রাণগোপাল বাবুর গুরু বিশিষ্ট সাধক স্বামী বালানন্দজীর আশ্রম।

একদিন প্রাণগোপাল বাবু মাকে তাঁর গুরুর আশ্রমে নিয়ে গেছেন। বালানন্দজী মহারাজ তখন ছিলেন তাঁর নিজের ঘরে।

মা এসেছেন—আশ্রমবাসীরা সবাই মিলে মাকে সযত্নে ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে বসিয়ে মহারাজের নিকট মায়ের আগমন-সংবাদ পৌঁছে দিলেন। সংবাদ পেয়েই তিনি বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করে উপস্থিত হলেন মায়ের কাছে। এসেই তিনি মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে বললেন,—'মা, তুমি যে সেদিন আমার কাছে এসেছিলে, সেদিন তোমার চলে যাওয়ার পর থেকেই মনে একটা অস্বস্তিবোধ করছিলাম। জানি না কেন। তোমার সেবায় কোনো ত্রুটি হয়েছিল কিনা, কে জানে। সেদিন থেকে কেবল-ই ভাবছি আবার কবে আসবে। যাক্, আজ আবার এসেছ মাগো, এবার...বলতে বলতে-ই তিনি আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে পড়লেন। দুচোখ তাঁর ছল ছল করে উঠল।

মহারাজের কথা শুনে আমরা তো অবাক। সে কি কথা!—মা তো এর পূর্বে কখনো এখানে আসেন-ই নি। আমরা তো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে-ই আছি। অবাক হয়ে আমরা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আর মা? মা কি বললেন জানো? মা তাঁর কণ্ঠস্বরকে খুব করুণ করে বললেন,—"হ্যাঁ, বাবা, সেদিন তোমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ করছিলে না? তাই তোমাকে দেখতে এসেছিলাম, তুমি কেমন আছ? বলেই মা জিজ্ঞাসা করলেন,—'বাবা, এখন ভালো আছো তো?'

মায়ের কথা শুনে আমরা তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি। মা তো কখনো ইতিপূর্বে এখানে আসেন-ই নি। তবে কি মা ভুল করে অন্যত্র যাবার কথাকে এখানে আসার কথা বলে ফেললেন! মাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে মা শুধু অল্প হেসে নীরব রইলেন। মায়ের ঐ হাসি দেখে ব্যাপারটার আমরা যেন একটা কূল-কিনারা খুঁজে পেলাম।

তোমরা কি বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা হ'ল এই যে, মা হলেন ঠাকুর দেবতার মত ধ্যান-গম্যা। ধ্যান-গম্যা বোঝ তো? যেমন ভগবানের ধ্যান করলে, তাঁকে স্মরণ করলে তিনি ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন, দেখা দেন, তাঁব সঙ্গে কথা কন, ঠিক তেমনি মাকে ধ্যান করলে, মাকে ডাকলে অন্তর্যামী মা তার কাছে চলে আসেন, তাকে দেখা দেন, কথা বলেন। তুমি যদি মার ধ্যান কর তুমি দেখবে মা তোমার হৃদয়ে এসে, চতুর্দিক আলোকিত করে বসে আছেন অপূর্বসুন্দর সমুজ্জ্বল মূর্তিতে। তখন তুমি কথা কইলেই, তিনিও তোমার সঙ্গে কথা কইবেন। তখন তোমার কেমন লাগবে বলতো?

যাক্, ঈশ্বরের এই ধ্যান-গম্যতা বড় বিস্ময়কর নয় কি! কারণ, দেখ। পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের সর্বত্র মা তো ঘুরে বেড়ান, তা তো তোমরা জান-ই। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে—যেমন বিলেতে, আমেরিকায়, কি রাশিয়ায় মা কখনো যান নি, বা যান না। কেন যান না, সে আলাদা কথা। কিন্তু মা যে বিদেশে যান না তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। অথচ সেই সুদূর দেশ বিদেশ থেকে অহরহ মার কাছে পত্র লেখেন বহু লোক—বড় বড় পাদরী, বড় বড় ফকির, বড় বড় সাধুমহাত্মা ও ধর্মযাজক। তাঁরা কি লেখেন জানো? তাঁরা লেখেন,—'মা আজ আমার দেবালয়ে বা, মসজিদে, বা গীর্জাঘরে এসেছিলেন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর মূর্তিতে। আবার কেউ কেউ লেখেন,—'মা আজ আমার দেবালয় তোমার উপস্থিতিতে পবিত্র হ'ল। তোমার দর্শন পেয়ে ধন্য হ'লাম।' আবার কেউ কেউ এও লেখেন যে,—'মা, আজ তোমাকে দেখলাম। তুমি সাদা ধুতি পরে, মাথায় চূড়া বেঁধে আমার ঠাকুরের সিংহাসনে বসেছিলে। গলায় দোলান ছিল তোমার গোলাপ ফুলের মালা। আজকের এই স্মৃতি আমার কাছে চিরন্তন হয়ে রইল।'

এবার একবার ভেবে দেখ, আমরা যখন মাকে কাছে পেয়ে কীর্তনে বিভোর

হয়ে দুলছি, ঠিক তখনই হয়ত মা কোথায়ও কোন সুদূর দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। চলে গেছেন কোনো ভক্তের হৃদয়ে। শান্ত সমুজ্জ্বল মূর্তিতে আলোকিত করে বসে আছেন তার অন্তঃপুর। ব্যাপারটা কি বিচিত্র নয়!

অথচ এ-জাতীয় ব্যাপার কিন্তু মাকে কেন্দ্র করে অহরহ ঘটছে। কে কোথায় বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে মাকে ডাকছে। কে কোথায় রোগ-শোকে জর্জরিত হয়ে কাতর প্রাণে 'মা' 'মা' বলে চীৎকার করছে—সে সবই যেন মা দেখতে পাচ্ছেন।

একবার আমরা হিমালয়ের কোলে আলমোড়া শহরে মার কাছে সৎসঙ্গে বসে আছি, বেলা তখন প্রায় ১০৷৷টা, সৎসঙ্গ চলছে। অকস্মাৎ অবাক বিস্ময়ে আমরা সবাই দেখলাম মার সমগ্র শরীর ভিজে, সর্বাঙ্গ গড়িয়ে জল ঝরছে। এত জল যে মার পরিহিত বস্ত্র ও মার বসার আসনখানি পর্যন্ত ভিজে একেবারে জবজবে। হিমালয়ের কোলে এই শীতের দেশে এ কী কাণ্ড! সে দিন অনেক চিন্তা করেও কিন্তু তার কোনো হদিস আমাদের মেলেনি।

তার চার দিন পরের ঘটনা। মায়ের-ই কাশী আশ্রম থেকে ডাকে এক চিঠি এসেছে। পত্রের লেখক চিঠিতে লিখছেন,—'আজ বেলা প্রায় ১০৷৷টায় আমি গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে স্রোতের প্রবাহে ভেসে যাই। দুপুর বেলা, গঙ্গার ঘাট জনশূন্য। আমি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়ে প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকি—'মা বাঁচাও, মা বাঁচাও।' 'তারপর কি হ'ল জানি না, আমার মনে হ'ল, কে যেন আমার হাত ধরে টেনে ঘাটের এক পাশে ফেলে দিল। আমি চেয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই। ঘাটের এক পাশে পড়ে আমি হাঁপাচ্ছি। মায়ের কৃপাতে-ই এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি ভাই......ইত্যাদি।'

সেই পত্রের তারিখ ও সময় মিলিয়ে দেখা গেল, এই তো সেই দিন। ঠিক সেই সকাল ১০৷৷টা যেদিন সৎসঙ্গে বসে মার সর্বাঙ্গ ভিজে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

চিঠিখানা মাকে পড়ে শোনাতে-ই মা একটু মৃদু হেসে বললেন,—'ওকে লিখে দাও ভগবান রক্ষা করেছেন।'

ভাইজীর জীবনেও ঠিক এ জাতীয় ঘটনাই এক দিন ঘটেছিল। ভাইজী কাশীতে—৺কাশীবিশ্বনাথ দর্শনে যাবার পূর্বে গঙ্গাস্নানে নেমেছেন। হঠাৎ পা পিছলে তিনি অথৈ জলে গিয়ে পড়েন, আর হাবুডুবু খেতে থাকেন। ঘাটে উপস্থিত এক ভদ্রলোক ভাইজীকে তোলার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু

তিনিও আর উঠতে পারেন না, উভয়ের নিশ্চিত মৃত্যু। ঐ অবস্থা থেকে উভয়ে-ই কী ভাবে যে গঙ্গার ধারে এসে পৌছালেন, তা তাঁরাও জানেন না।

এ দিকে মা তখন ছিলেন দেরাদুনের রায়পুর গ্রামে। মাতৃভক্ত কমলাকান্ত তখন মায়ের নিকট উপস্থিত ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখলেন, অর্ধশায়িতা মায়ের শরীর, চুল, কাপড়, সেমিজ সব জলে চুপ্ চুপে্ ভেজা। মনে হ'ল মা যেন সত্ত স্নান করে উঠেছেন।

অনেকদিন পরে ভাইজীর নিকট ঘটনা শুনে জানা গিয়েছিল, উভয় ঘটনার সময় তারিখ একই।

আর একবার আমেরিকা থেকে এক ইংরেজ মহিলা সত্ত ভারতে এসেছেন। তিনি কিন্তু একজন সাধিকা। তিনি ভারত ভ্রমণে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে তাঁর শিষ্যাস্থানীয়া দু জন ইংরেজ মহিলা। ভারতের কয়েকটি স্থান দর্শন করে শেষ পর্যন্ত তিনি এসেছেন বৃন্দাবন ধামে। মা তখন তাঁর বৃন্দাবন আশ্রমে-ই ছিলেন। সেই মহিলা মাকে ইতিপূর্বে কখনো দেখেন নি। নামও শোনেন নি। শ্রীবৃন্দাবনে এসেই তিনি শুনতে পেয়েছেন, মা আনন্দময়ী নামে এক সাধিকা নাকি বর্তমানে বৃন্দাবনে আছেন। তাই, সংবাদ নিয়ে তিনি মার দর্শনে এসেছেন।

মার কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি মাকে দেখেই বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন,– 'আরে ইনি-ই মা আনন্দময়ী, আমি যে আমেরিকাতে আমার ধ্যান মন্দিরে বসে কয়েকবার এঁর দেখা পেয়েছি—ঠিক এই বেশ, এই অর্ধশায়িত ভঙ্গিমা, মস্তকে চূড়াবাঁধা কেশগুচ্ছ। বলতে বলতে ভদ্রমহিলা অপলক দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মা-ও তাঁকেই দেখছেন। মার দুচোখে যেন স্নেহ-নির্ঝর !

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রমহিলা বিদায় নিলেন। আমাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মা হেসে শুধু বললেন,– 'এর মধ্যে আর বিচিত্রতার কি আছে!' সত্যি-ই বিচিত্রতার আর কি আছে! তোমরা কি বল ? অবশ্যি তোমরা কিন্তু ভেব না এই সব দর্শন সর্বদা সূক্ষ্মে-ই হতো। স্থূল ভাবেও এ জাতীয় ঘটনা মার জীবনে অহরহ ঘটেছে। মায়ের লীলাখেলার জীবনে এরূপ-ও কত দৃষ্টান্ত আছে যে একই দিনে, এক-ই সময়ে মা স্থূল শরীর নিয়ে বিভিন্ন ভক্তদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বিভিন্ন কয়েকটি স্থানে। আর এ প্রসঙ্গে

মাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করো, মা সরল ভাবে বলে বসেন, 'ভগবানের রাজ্যে যে অসম্ভব বলে কিছু-ই নেই। কাজেই সবই যখন সম্ভব এখন তোমার আর আমার বলার আর কি থাকতে পারে।' যাক সে কথা।

মা আছেন বৈদ্যনাথ ধামেই। নিয়মিত ভাবে আশ্রমে নিত্যকীর্তনে মাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর স্বামিজীর কীর্তন সে-ও তো অপূর্ব। তিনি যখন কীর্তন করেন, তখন স্বামিজীর বাহ্য জ্ঞান-ও বুঝি লুপ্ত হয়ে যায়। একদিন এই ভাবোন্মত্ত কীর্তনে মার-ও সে কি ভাব! দুপায়ের দু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ওপর ভর করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মা ভাবের দোলায় দুলতে লাগলেন আর তাঁর অর্ধ-নিমিলিত চোখের দৃষ্টিতে যেন কোন আনন্দলোকের স্ফুরণ! আমরা তো মার অবস্থা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্‌।

সত্যি নাম কীর্তনের সঙ্গে মায়ের যেন একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। তোমরা-ও শুনে থাকবে যে নাম ও নামী এক। মা-ও বহুবার বহু প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন।

এই দেওঘর বৈদ্যনাথ ধাম থেকেই একদিন রাজশাহী কলেজের প্রফেসর শ্রীগিরিজা শংকর ভট্টাচার্য মাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেছেন। সেখানে সে দিন বসেছে এক সৎসঙ্গের আসর। মাকে সৎসঙ্গে বসান হয়েছে। সঙ্গীয় ভক্তরাও মায়ের কাছে বসে আছে। অকস্মাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন, মার শরীর কেমন যেন এলিয়ে পড়ছে। কী ব্যাপার! ভোলানাথ মার পাশে-ই বসেছিলেন। তিনি তো মার শরীরের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে মার হাত তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি দেখেন,—'সর্বনাশ, মার নাড়ী তো পাওয়া যাচ্ছে না। এখন উপায়! হঠাৎ ভোলানাথের মনে পড়ল মার শৈশবের কথা। শৈশবেও কখনো কখনো মার শরীর এমনি এলিয়ে পড়ত। আর সে অবস্থা হ'লেই দিদিমা নাম কীর্তন আরম্ভ করে দিতেন। সে কথা মনে পড়তে-ই ভোলানাথও ব্যস্ত হয়ে ভক্তদের বললেন—'নাম কীর্তন কর! নাম কীর্তন কর।' ভোলানাথের বলার ভঙ্গি ও ব্যস্ততা দেখে সবাই উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন আরম্ভ করলেন। ভোলানাথ নিজেও খুব সুন্দর কীর্তন করতে পারতেন। তিনিও কীর্তনে যোগ দিলেন। আরম্ভ হ'ল তুমুল ভাবে কীর্তন। ধীরে ধীরে মার শরীর যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল। মায়ের চোখমুখের স্বাভাবিক অবস্থা দেখে সকলে আশ্বস্ত হলেন।

এই ব্যাপারটা তোমাদের খুব সহজ ভাবে বললাম, কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। কেন? তাও শোনো। মায়ের এই অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়া, এ প্রসঙ্গে মা একদিন বলেছিলেন,—'এরূপ অবস্থায় ফিরে আসার খেয়াল নাও হতে পারে। ফিরে আসার খেয়াল শুধু তোমাদের নাম কীর্তনের আকুলতায়।' তাহলে ভেবে দেখ ব্যাপারটা সামান্য তো নয়-ই বরং কতখানি ভয়াবহ।

আর এই ভয়াবহতা কতখানি ভয়াবহ তা-ও তোমাদের শোনাচ্ছি। অনেক দিন পূর্বের কথা। মা তখন ঢাকায়। একদিন রাত্রিতে মা ঘুমিয়ে আছেন। মার ঘুম যে কি তা তো আগেই তোমাদের বলেছি। মা ঘুমিয়ে আছেন। মায়ের সেবিকা গুরুপ্রিয়া দেবী শুয়ে আছেন মার ঘরে-ই মার কাছে-ই। হঠাৎ গুরুপ্রিয়াদিদি শুনতে পেলেন মা যেন কি বলছেন। কি বলছেন মা,—অনেক চেষ্টা করে-ও তিনি তা বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারছেন না, কারণ কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অবোধ্য। দিদি উঠে বসলেন। তিনি মাকে লক্ষ্য করতে-ই দেখেন মার খোলা দু চোখের দৃষ্টি স্থির; মুখের ভাব, শরীরের অবস্থা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখেন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-ও বন্ধ। সে অবস্থা দেখে তুমি আমি হলে কি করতাম বলতো? ভয়ে চীৎকার করে উঠতাম না কি? কিন্তু দিদির কাছে মায়ের এ অবস্থার পূর্ব-পরিচয় আছে তাই তিনি তাড়াতাড়ি মাকে স্পর্শ করে বসে নাম কীর্তন আরম্ভ করে দিলেন। নাম-কীর্তনের ফলে মার বোধ হয় খেয়াল ফিরল। ধীরে ধীরে মা ফিবে এলেন স্বাভাবিক হয়ে। ওদিকে ততক্ষণে রাত্রি প্রায় ভোর।

এবার বুঝেছো ব্যাপারটা কতখানি ভয়াবহ।

যাক্, যথাসময়ে মা দেওঘর থেকে, কলকাতা হয়ে ঢাকায় ফিরে এলেন। ঢাকায় ফিরে মা কিছুদিন শাহাবাদে-ই রয়ে গেলেন।

দিন গড়াতে লাগল। ধীরে ধীরে মাকে কেন্দ্র করে ভক্তের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। ভক্তেরা আসেন। ভোলানাথের নেতৃত্বে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা জমজমাট কীর্তন চলে। কীর্তনের আনন্দ-নেশায় সব-ই মশগুল।

তোমরা তো জান-ই এই সাহাবাগের কাছেই আছে সিদ্ধেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরীর কথা তোমাদের পূর্বে-ই বলেছি। মা এবার সিদ্ধেশ্বরীতে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। সিদ্ধেশ্বরীতে মায়ের সেই হাত-ঢোকানো গর্তটি—মা দিনের বেলা

প্রায়-ই সেখানে বসে থাকেন। ভক্তরা-ও সেখানেই মাকে ঘিরে বসে। মা-ও সেখানে বসেই তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ক'ন।

একদিন মা সেই গহ্বরে বসে আছেন, গুরুপ্রিয়া দিদি দাঁড়িয়ে আছেন নিকটে-ই। হঠাৎ মা বলে বসলেন,—"এই খুকুনী, (গুরুপ্রিয়া দেবীর ডাক নাম 'খুকুনী') এই গর্তের মধ্যে এসে বসতে পারিস্?"

তোমরা তো বুঝতে-ই পারছ, একে তো গর্ত, তার ভেতর থেকে কত লাল রংয়ের রক্তমাখান জল বেরিয়েছিল, তাও তোমরা পূর্বে-ই শুনেছ। সেই গর্তের মধ্যে ঢুকতে কি কারো সাহস হয়! কে জানে তার মধ্যে কি আছে!

তবু-ও খুকুনী ভাবছেন,—'মা তো বসেই আছেন। দেখি-ই না গর্তে নেমে কী হয়।' এই ভেবে যেমনি তিনি এগিয়েছেন, মা হঠাৎ সেই গর্তের ভেতর থেকে-ই কতগুলো ফুল আর দূর্বা বার করে খুকুনীর দিকে ছিটিয়ে দিলেন। বললেন,—'তুই তো খুব শক্ত। আয় আমি তোর পূজো করছি।' ব্যস, এ কথা বলতে বলতে-ই মায়ের চোখমুখ কী রকম হয়ে গেল। মা উঠে দাঁড়ালেন—ঢুলু-ঢুলু তাঁর ভাব, সমস্ত শরীর ঘিরে একটা জ্যোতির আবরণ। মা টল্‌ভে টল্‌তে এগুতে লাগলেন—মনে হ'ল পড়েই যান বুঝি!

উপস্থিত ভক্তরা তো মায়ের সেই রকম সকম দেখে কী করবে না করবে ভেবে না পেয়ে, কেউ চণ্ডীর স্তবস্তুতি পড়তে আরম্ভ করল, কেউ বা মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে বলতে আরম্ভ করল,—'মা, মাগো, এ কী হ'ল মা? আবার আর একদল খুব জোরে কীর্তন আরম্ভ করে দিল। কী তুমুল নিনাদী সে কীর্তন। কীর্তনের তালে তালে মার সমস্ত শরীর প্রচণ্ড বেগে দুলতে লাগল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে-ই তিনি মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন, আর চোখে মুখে হ'তে লাগল ভাবের ঘন ঘন পরিবর্তন। টল্‌তে টল্‌তে মা কখন যে খুকুনীর কাছে এসে গেছেন তা কেউ লক্ষ্যও করেনি। হঠাৎ মায়ের দক্ষিণ হস্ত খুকুনীর শরীর স্পর্শ হ'তেই বলে উঠলেন,—'উঃ কী ঠাণ্ডা!' আর খুকুনী দিদি? হিম-শীতল সেই হাতের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খুকুনী দিদির দু চোখে নেমে এলো অশ্রুর জোয়ার। তিনি-ও চীৎকার করে দেবীর স্তবপাঠ আরম্ভ করে দিলেন। চকিতে মা সেই আলুথালু বেশে অদূরস্থিত কালী মন্দিরে ঢুকে গেলেন। কালী মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করে খুব কঠিন স্বরে বললেন,—'সকলকে বলে দাও, ওরা আজ যা দেখলো কেউ যেন মুখে তা উচ্চারণও না করে। মনে

রেখো। মনে রেখো। মনে রেখো।' তিন বার বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। এর-ই মধ্যে কখন দিন গড়িয়ে রাত, আবার রাত গড়িয়ে প্রত্যুষের আলো ফুটে উঠল কেউ তা লক্ষ্যও করে নি।

তারপর রাত্রি শেষের তরল অন্ধকারের আবরণে মা একবারে শাহবাগে ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন—একবারে শান্ত সহজ ভাবে—যেন সারারাত ধরে কিছু-ই হয় নি, তিনি কোথাও যাননি। রাত্রি শেষে তিনি যেন ঘুম থেকে উঠে এলেন মাত্র।

আবার তুদিন যেতে-ই আর এক লীলা। গুরুপ্রিয়া দিদির বাবার নাম ছিল শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায়। তিনি তৎকালীন ঢাকা জিলার সিবিল সার্জন ছিলেন। একদিন তিনি এসেছেন মায়ের দর্শনে। তিনি এসে মায়ের কাছে সবে দাঁড়িয়েছেন। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ মা তাঁর পায়ের ধূলো নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। শশাঙ্কবাবু তো হকচকিয়ে দশ পা পিছিয়ে গেলেন —কী সর্বনাশ! কত ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন সাক্ষাৎ জগৎ-জননী! আর তিনিই কি না নেবেন তাঁর পায়ের ধূলো! এ যে মহাপাপ! এ হ'লে নরকেও যে তাঁর স্থান হবে না। ভাবলেন তিনি।

এদিকে মা কিন্তু তাঁকে সরে যেতে দেখে, সম্মুখে যাকে পান তাকেই বলেন, 'আমাকে পায়ের ধূলো দাও। দাও না। এই বলতে বলতেই মা কাঁদতে লাগলেন। সে কি কান্না! তু চোখে অঝোর ধারায় ঝরছে জল, বেশবাস অব্যবস্থিত হয়ে পড়েছে—কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—'আমাকে পায়ের ধূলো না দিলে কিন্তু আমি চলে যাব—এক্ষুনি চলে যাব। আমাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।'

কী মুস্কিল বলতো! 'চলে যাব' বলতে বলতেই তিনি বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।

'মা চলে যাবেন। কেউ তাঁকে আটকাতে পারবে না'—চতুর্দিকে ভক্তরা কেঁদে আকুল—'মা, মাগো, তুমি কোথায় যাবে!' সে কথার উত্তর নেই। মা চলে যাবেন। উপায়ান্তর না দেখে ভোলানাথ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,—'কে দেবে তোমাকে পায়ের ধূলো। তোমার নিজেরও তো পা আছে, নাও না পায়ের ধূলো।'

হঠাৎ মা বসে পড়লেন। নিজের পায়ের ধূলোই মাথায় নিয়ে শান্ত হ'লেন। শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছলেন।

বলো দেখি কী কাণ্ড!

যাক্ মা তো শান্ত হলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, 'দেখ, আজ কেউ আমাকে তোমরা পায়ের ধূলো দিলে না, আমিও আজ থেকে আমার পা কাউকে ছুঁতে দেব না।' এই কথা মার মুখ দিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তদের মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আর তো মায়ের পায়ের ধূলো পাওয়া যাবে না। এখন উপায়!

এর আর উপায় নেই। মায়ের মুখের কথা অমোঘ, অব্যয়! সে দিন হ'তে মার পা স্পর্শ করা নিষেধ হয়ে গেল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সেই কথা আর নড়েনি।

এই সাহবাগেই মায়ের যে কত লীলা হয়েছে তার কি আর ইয়ত্তা আছে। সেই সব লীলায় কখনো করুণাময়ী মায়ের সন্তান-স্নেহ উপচে পড়েছে, কখনো বা অলৌকিকতার বৈচিত্র্যে তা সমুজ্জ্বল!

একবার ছোট বয়সের একটি ছেলে, নাম তার নন্দু। নন্দুর হাতে অনেক দিনের পুরাণো একটা ঘা, তাতে খুব ব্যথা। সেই হাতে তার খাওয়ারও উপায় ছিল না। মায়ের বিচিত্র কার্য-কলাপের কথা শুনে একদিন ছেলেটির এক আত্মীয়া তাকে নিয়ে এলো মায়ের কাছে। বলল,—'মা বহুদিনের পুরানো এই ঘা, সারছেও না, ব্যথাও কমছে না। নিজের হাতে খাবারও উপায় নেই ওর। তুমি বল কি করি।

মা এই কথা শুনে, ছেলেটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বললেন,— 'নিজের হাতে খেতেও পারে না, বেশ তো সাতদিন পর থেকে ও নিজের হাতেই খাবে।'

যারা ছেলেটির অসুস্থতার ব্যাপারটা জানত, তারা ত সব অবাক। বলে কি? এত ডাক্তার, এত বদ্যি, এত ঔষধ, এত প্রলেপে—এত দীর্ঘদিন ধরেও যার কিছু হ'ল না তার সাতদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে? 'এ হ'তেই পারে না'—ভাবল তারা—'ও মায়ের একটা আশ্বাসবাণী মাত্র।' ও কথাটার কোন মূল্যই তারা দিল না।

দিন যায়। ঠিক ছয় দিন পরেই হঠাৎ মায়ের কাছে সংবাদ এলো—নন্দু খুব অসুস্থ। পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা। ঘন ঘন ভেদবমি হচ্ছে। ডাক্তারের নির্দেশে গত ছ দিন ধরে তাকে বার্লির জল খাইয়ে রাখা হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে মা পরদিন সকাল বেলা নন্দুকে নিয়ে আসতে বললেন। পরদিন ভোর হতেই ছেলেটিকে নিয়ে আসা হ'ল মায়ের কাছে। মা বললেন,—'ও যা যা খেতে ভালবাসে, ডাল, তরকারী, পোলাউ, লুচি ইত্যাদি সব রান্না কর।'

যথাসময়ে তাও হয়ে গেল। ছেলেটির কিন্তু তখনো সেই ভেদবমি চলছেই।

হঠাৎ মা ছেলেটিকে উঠে বসতে বললেন। ছেলেটি বসল। একটা থালায় যাবতীয় খাবার সাজিয়ে ওর কাছে দিতেই, ও মার দিকে তাকিয়ে বল্ল, 'খাই' ?

মা 'খাও' বলতে না বলতেই, ছেলেটি নিজের হাতেই খেতে আরম্ভ করল। যারা উপস্থিত ছিল তারা তো অবাক! কোথায় গেল ওর হাতের ব্যথা, আর কোথায় গেল ওর ভেদ ও বমি। স্বাভাবিক ভাবে খেয়ে ছেলেটি উঠে দাঁড়াল। সে দিন থেকেই সে সুস্থ হয়ে গেল।

আর একবার একটি খুবই ছোট ছেলের ঘটনা। ছেলেটির জন্মাবধিই তার দক্ষিণাঙ্গ অসাড় ও অচল। তার-ও বহু প্রকার চিকিৎসাদি করান হয়েছে—কিন্তু কোন ফলই হয়নি। অনেকের পরামর্শে ছেলেটির পিতামাতা ছেলেটিকে একবার নিয়ে এল মায়ের কাছে। তাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই মা বললেন,—'আজ নয় বৃহস্পতিবার।' আশ্চর্য তো! কি ব্যাপার জানা নেই শোনা নেই, ওরা কেন এসেছে জিজ্ঞাসাবাদ নেই, মা বলে বসলেন, 'আজ নয় বৃহস্পতিবার।'

কি আর করা। পিতামাতা বৃহস্পতিবারই ছেলেটিকে নিয়ে আবার এলেন। তখন দ্বিপ্রহর, মা ঘরে বসে বসে সুপুরী কাটছিলেন।

ছেলেটিকে মার সামনে এনে শুইয়ে দিতেই মা একটা আধ-কাটা সুপুরী ছেলেটির দিকে গড়িয়ে দিয়ে বললেন, —'নে'।

সুপুরীটি ওর দিকে গড়িয়ে আসতে দেখেই ছেলেটি তা ধরবার জন্যে হামা-গুড়ি দিয়ে সুপুরী নিয়ে তার মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। সবাই দেখল, ছেলেটির কোনো অঙ্গই অসাড় নয়। সে হামাগুড়ি দিয়ে সুপুরী নিয়ে তার

মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। তারপরে আর তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়নি। সে ছেলেটি সম্পূর্ণ সুস্থই ছিল।

আর একবার ঢাকায় এক বাড়ীতে মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, গৃহস্বামী তার বাড়ীতে মার ভোগ দেবেন বলে। যথাসময়ে মায়ের ভোগ হয়ে গেছে, মাকে বসান হয়েছে তাঁর বিশ্রামকক্ষে। এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর এক ভদ্রলোক এসে মাকে বলছেন যে তাঁর স্ত্রী আজ দীর্ঘ দু বৎসর ধরে অসুস্থ, তাঁর ফিটের ব্যারাম। ঘন ঘন ফিট হয়ে পড়ে। মা যদি একবার দয়া করে তাঁর বাড়ীতে পদধূলি দেন!

মা তো গেলেন। গিয়ে দেখেন গৃহবধূ শয্যায় শায়িতা, অতিমাত্রায় জীর্ণ-শীর্ণ রুগ্ন চেহারা। মাকে দেখেই তো তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। মারও কি খেয়াল হ'ল, তিনি বৌটির কানের কাছে আস্তে আস্তে বললেন, —'কাঁদবার কি? বৃহস্পতিবার কবে? বৃহস্পতিবার আসবে।'

ব্যস আর কোনো কথাই হ'ল না। মা ভক্তদের নিয়ে ফিরে এলেন শাহবাগে। পরের বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে দেখা গেল সেই বৌটি একটি ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক ছেলেকে সঙ্গে করে মার কাছে এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার! শোনা গেল, গত দু বছর ধরে ভদ্রমহিলার এই একটি মাত্র সন্তান নিখোঁজ। দীর্ঘ দু বৎসর পরে আজ সে এসে উপস্থিত। তাকে নাকি একদল লোক বন্দী করে রেখেছিল। গত মঙ্গলবার সে একটু সুযোগ পেয়েই সব বিপদ অগ্রাহ্য করে পালিয়ে এসেছে।

সেই থেকে বৌটির ফিটের ব্যারামও চিরতরে আরোগ্য হয়ে গেছে। ঘটনাগুলো শুনতে অদ্ভুত লাগে না?

আরো একবার মা তখন নবদ্বীপের এক মন্দিরে। মা সৎসঙ্গে বসে আছেন, মাকে ঘিরে বহু লোক। হঠাৎ দুই নবাগত ভদ্রলোক সৎসঙ্গ ঘরে ঢুকতেই মা উঠে চলে গেলেন তাঁর বিশ্রামকক্ষে। আগন্তুক দু জন মায়ের ভক্তদের নিকট প্রার্থনা জানাল যে, তারা মায়ের দর্শন প্রার্থী। তারা বিশেষ বিপদগ্রস্ত। বহু দূর থেকে করুণাময়ী মায়ের নাম শুনে তারা মায়ের কাছে এসেছে।

তাদের কথা মাকে জানাল হ'ল। সব শুনে মা বললেন, 'ওদের কাল সন্ধ্যের পরে আসতে বলে দাও। দিনের বেলা যেন না আসে।'

তোমরা-ই বল, এসব কথা শুনলে তোমাদেরও কি কৌতুহল হ'ত না। উপস্থিত সকলের মনেই একটা কৌতুহল জেগে উঠল।

যাই হোক মায়ের নির্দেশ তাদের জানিয়ে দেওয়া হ'ল। ওরা কিন্তু জিদ্ ধরে বসে রইলো। বললেন, 'মায়ের সঙ্গে দেখা না করে তারা যাবেন না। তাদের সমূহ বিপদ।'

পুনরায় মাকে জানান হ'ল। মা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বললেন,—'কি আর করা! তবে ওদের বলো, ওরা যেন আজ সন্ধ্যার পরে দেখা করে, দিনের আলো থাকতে যেন আসে না। ওদের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে দাও।

আগন্তুকদ্বয় কিন্তু তাতেও রাজি নয়। ওদের মায়ের নির্দেশ বললেই ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে বললো,—'আমাদের মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? আপনারা কেন মাঝখান থেকে কথা বলছেন?'

মাকে একথা বললে, মা যেন উদাস ভাবেই বললেন,—'কি আর করা। যা হবার তাই তো হয়। ওদের নিয়ে আস।'

ওরা মায়ের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে চলে গেলো। আমরা মায়ের কাছে যেতেই মা একটু করুণ সুরেই যেন বললেন,—'বিধির বিধান অমোঘ। যা হবার তা হবেই।' এই বলে মায়ের পরিহিত বস্ত্রের কিয়দংশ ছিঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এটা বাইরে নিয়ে জ্বালিয়ে দাও।' মায়ের আদেশ পালন করা হ'ল।

পরদিন সংবাদ পাওয়া গেল—'আগন্তুক দু'জন ছিল দুই ভাই। বড় ভাইয়ের স্ত্রী মারাত্মক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর সুস্থতা কামনা করতেই তারা এসেছিলেন মায়ের কাছে। মাও সে অনুসারেই তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা মায়ের সে নির্দেশ মানতে পারলই না। তারা প্রতিপদেই মার খেয়ালকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফিরে দেখেন সেই মহিলার দেহান্ত হয়ে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অন্তিম দৃষ্টি মেলে কাকে যেন খুঁজছিলেন, কিন্তু যাকে খোঁজা, তাঁর দেখা আর তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

মায়ের নিকট সে সংবাদ দিলে মা শান্ত ভাবে বললেন,—'যা হবার তা এভাবেই হয়ে যায়। ওর শরীরটা তো আর থাকবার নয়, তাই কাল কাপড়ের একটা টুকরা পোড়াইয়া নিলাম। সব তো একই!'

এ জাতীয় ঘটনা মার জীবনে যে কত ঘটেছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। এসব ঘটনা থেকে কি স্পষ্টতঃই অনুমান হয় না মা সর্বত ও শাশ্বতদৃষ্টি!

এ যেমন মায়ের এক জাতীয় খেয়াল, তেমনি এবার শোন মার আর এক জাতীয় খেয়ালের কথা।

যে শাহাবাগে মা থাকতেন, সে বাগের মালিক ঢাকার নবাবজাদা প্যারীবানু। প্যারীবানুর বিবাহ উপলক্ষে কলকাতা থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে তোমাদের পরিচিত ৺চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবীও আছেন। মাও তখন ঢাকাতেই উপস্থিত।

একদিন মা চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরে, কপালে সিঁদূরের বড় করে ফোঁটা দিয়ে বসে আছেন। অপর্ণা দেবী মার কাছে এসেই হঠাৎ যেন কেমন চকিত হয়ে পড়লেন। অনেক দিন পূর্বের একটি ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠল। তাঁর মনে পড়ল, অনেক দিন পূর্বে তাঁর মা বাসন্তী দেবী একদিন শেষ রাত্রে একটি দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত চকিত হয়ে কন্যা অপর্ণাকে বলেছিলেন,—'দেখ অপর্ণা, চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরে কপালে বড় করে সিদূঁরের ফোঁটা দিয়ে গৌরবর্ণা কে এক মহিলা যেন আমাকে বলে গেলেন, 'তোমার ভয়ানক বিপদ আসছে।'

কে তিনি? কি তাঁর বিপদ? তখন তার কোনো উত্তর তাঁরা খুঁজে পান নি।

তার কিছুদিন পরেই ৺চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাসন্তী দেবীর বুঝতে বাকী থাকে না কি ছিল তাঁর বিপদ। কিন্তু কে সেই মহিলা যিনি পূর্বাহ্নেই তাঁর বিপদের সূচনা দিয়েছিলেন? সে প্রশ্ন তাঁর অমীমাংসিতই রয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য পরবর্তী কালে একবার ঘটনাচক্রে মায়ের সঙ্গে প্যারীবানুর এই বাড়ীতেই বাসন্তী দেবীরও দর্শন ঘটেছিল, তখনই তিনি এমনি চকিত হয়েই বলেছিলেন, —'এই তো সেই মূর্তি। যিনি আমার বিপদের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন।'

আজ অপর্ণাদেবীও সেই স্মৃতি মনে করেই চমকে উঠেছিলেন। তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল, ইনিই সেই মা আনন্দময়ী যিনি আমাদের বিপদের কথা বলে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিলেন।

আর একবার মা কেবল বলে চলেছেন, —'সাপ, সাপ, সাপ।' ব্যাপার কি কিছুই বোঝা গেল না। কোথায় সাপ, সাপ কোথাও নেই।

এর দুদিন পরেই মাকে নিয়ে নৌকো করে কোথাও যাওয়া হচ্ছে। মা বসে আছেন একেবারে নৌকোর ধার ঘেঁসে। হঠাৎ নৌকোতে উপস্থিত অন্যান্য ভক্তরা লক্ষ্য করে দেখলো একটি সাপ অত্যন্ত তীব্র গতিতে মায়ের দিকেই সাঁতার কেটে আসছে। মার দিকে তাকাতেও দেখা গেল, মাও অপলক দৃষ্টিতে সাপটিকেই দেখছেন। নৌকার মাঝিও বোধহয় সাপটিকে লক্ষ্য করেই নৌকার গতি তীব্রতর করে দিতেই সাপটির গতিও তীব্রতর হয়ে উঠল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাপটি মায়ের দিকে নৌকোর গা ঘেঁসে উঠতে লাগল।

মাঝি-মাল্লারা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে নৌকারোহীদের জিজ্ঞাসা করল'— 'লগির ঘায়ে সাপটিকে মেরে ফেলি ?'

সকলে মার দিকে ফিরে তাকাল। মা কিন্তু সাপের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বললেন, —'পারলে মার দেখি।'

মাল্লারা সাপটিকে মারতে উদ্যত হয়েই, অবাক! কোথায় সাপ ? সাপের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই। সবাই ভাবল বোধ হয় নদীর জলেই ডুব দিয়েছে।

মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা বললেন, 'মহাপুরুষ, দর্শন দিয়ে চলে গেছেন।'

আর একবার মা উত্তর প্রদেশের বিন্ধ্যাচল পর্বতের ওপরে অষ্টভূজাদেবীর মন্দিরের সম্মুখের চাতালে বসেছিলেন। হঠাৎ ওপরের দিকে হাত দুখানা বাড়িয়ে দিলেন। যেন কোনো শিশুকে কোলে নেবার ভঙ্গিমা।

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে মায়ের ভঙ্গিমা লক্ষ্য করে ওপর দিকে তাকাতেই দেখা গেল, ওপরে গাছের শাখায় ঝুলন্ত দুটি সাপ।

সাপ দেখেই ভক্তগণ,—'মা, ওঠ, ওঠ। সাপ সাপ।' বলতে বলতে-ই আর সে সাপ দুটিকে দেখা গেল না। চক্ষের পলকে ভোজবাজীর মত তারা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে!

মায়ের দিকে তাকাতেই মা বললেন, —'দেখছিলাম, এক মহাত্মা ও তার শিষ্য। মহাত্মাটি এই শরীরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল।

মাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'ঐ সাপ দুটিই কি সেই মহাত্মা ও তাঁর শিষ্য ?'

মা সে কথার আর কোনো উত্তর দিলেন না। নীরবে, অনন্তপ্রসারী দৃষ্টি মেলে সে দিকেই তাকিয়ে রইলেন। বোঝা গেল না, তখনো কি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সেই মহাপুরুষদ্বয় প্রতিভাত রইলেন।

সাপের সঙ্গে মহাপুরুষদের ও মায়ের কি সম্পর্ক জানি না। কিন্তু সর্পরূপে মহাপুরুষদের মায়ের কাছে আগমনের ঘটনা, পূর্ব এবং পরবর্তী জীবনে বহুবার এবং বহু স্থানে সংগঠিত হয়েছে।

এই ভাবেই ঢাকা ও শাহাবাগে, এ জাতীয় লীলাখেলার মধ্য দিয়েই মাকে নিয়ে ভক্তদের জীবন বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হচ্ছিল। কীর্তনে, গানে, পূজা-পার্বণে মায়ের নিকট ধীরে ধীরে ভক্ত-সমাগমও বাড়তে লাগল। কিন্তু সে আর কদিন! এর-ই মধ্যে মায়ের ভাবধারায় যেন আবার কি রকম পরিবর্তন ঘটে গেল। মা জল দেখলেই জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইতেন। কখনো কখনো এমনও হ'ত যে জলের ধারে গেলে মাকে ধরে রাখাই কষ্টকর হয়ে উঠত। মা বলতেন, —'আমাকে ছেড়ে দাও। জল আমাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করছে যে এই শরীরটা জলের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। এ শরীর ও জলের মধ্যে কোনো পার্থক্যই তো দেখছি না। সবই যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে চাইছে।'

আবার হাঁটা-চলার ব্যাপারেও কিছুদিন কেমন যেন মার ভাবান্তর ঘটে গেল। মা হাঁটতে গেলেই শরীর টলে টলে পড়ে যেতে চাইত। ক্রমে পা মাটি থেকে ওপর দিকে তোলাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল মায়ের কাছে। মাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, —'কী বলব। এই শরীরটাকে আকাশ আকর্ষণ করছে। বাতাস যেমন সমস্ত শূন্যময় হয়ে আছে, এ শরীরটাও তেমনি শূন্যের আকর্ষণে শূন্যময় হয়ে যেতে চাইছে। তাই পা মাটি থেকে তুললেই শরীরটা শূন্যময় বলে বোধ হয়।' আবার এমনও হ'ত, মা বলতেন, —'শরীর জল, জল মাটি, মাটি তেজ, তেজ আকাশ, আরও কত কিছু।'

তোমরা যখন বড় হবে, আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ সব পড়বে, তখন দেখবে আমাদের শাস্ত্রও প্রায় এ কথাই বলে। শাস্ত্র বলে, আমাদের শরীর ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, হাওয়া ও আকাশ, এই পঞ্চভূত দিয়েই গঠিত। আবার এই সবই ব্রহ্মময় অর্থাৎ ঈশ্বরই এই সবের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তিনি ছাড়া কোথাও কিছুই নেই। মার এই লীলার মধ্যেও বোধ হয় এই তত্ত্বই ফুটে উঠেছে। মাও তো অনুভব করতেন সব কিছুই তাঁকে টানছে, সবের মধ্যে যেন তিনিই।

এই জাতীয় সব বিচিত্র অনুভূতির খেয়ালের মধ্য দিয়ে দিন গড়িয়ে চললেও কিন্তু একটা পরিবর্তনের ভাব সর্বদাই মার লীলার মধ্যে পরিলক্ষিত হ'ত। জীবনযাত্রার প্রণালী, জীবন-ভঙ্গিমার রকম-সকম সবই কেমন যেন ছিল ছাড়া ছাড়া। এতদিন মার ভক্ত সংখ্যা খুব অল্প না হলেও, সীমিত সংখ্যাতেই ছিল তা নিবদ্ধ। মা ছিলেন প্রায় গৃহবধূর ভূমিকাতেই। মাথায় ঘোমটা, চালচলনে আড়ষ্টতা, সকলের সঙ্গে বাক্যালাপেও ছিল কিছু সীমাবদ্ধতা।

কিন্তু সম্প্রতি ধীরে ধীরে তাঁর অনেক পরিবর্তন ঘট্‌তে লাগল। ক্রমে ক্রমে মাথার ঘোমটা ছোট হয়ে এলো, ভক্তসংখ্যাও বেড়ে চলল হু হু করে। মায়ের উপস্থিতিতে যে কোন উৎসবকে কেন্দ্র করে—উৎসবস্থল লোকে-লোকারণ্য হয়ে যেতো। কত আর্ত, জিজ্ঞাসু, কত আত্মান্বেষী মায়ের চরণে উপস্থিত হ'তে লাগলেন দিনে রাতে। মা যেন ধীরে ধীরে বিশ্বজননীর রূপে রূপায়িত হ'তে লাগলেন।

এই বিশ্বজননীর রূপের কথায় মার বধূ-জীবনের কয়েকটি কথা মনে পড়ছে। মা যে বিশ্বজননী, তা মায়ের বধূ-জীবনেই কারো কারো চোখে ধরা পড়েছিল। তোমাদের তা থেকে ২/১টি ঘটনা শোনাচ্ছি।

মা তখন কূলবধূ, ঢাকা অষ্টগ্রামে ভোলানাথের সঙ্গেই থাকেন। সেই গ্রামেই হরকুমার নামে এক ভদ্রলোকের বাস ছিল। হরকুমারের মা আর আনন্দময়ী মা একই গৃহের বিভিন্ন অংশের বাসিন্দা ছিলেন। আর হরকুমার থাকতেন ঐ পাড়াতেই অল্প দূরে তাঁর ভগিনীর গৃহে। ভদ্রলোক চাকরী-বাকরীও ভালোই করতেন।

এই হরকুমার বাবু প্রথম দর্শন হতেই মাকে খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। মার সুবিধা-অসুবিধার দিকে তিনি সর্বদাই লক্ষ্য রাখতেন। বর্ষা-বাদলের দিনে ভেজা কাঠে আগুন জ্বলে না, ধুঁয়োয় দু চোখ আসে অন্ধ হয়ে, মার রান্নার সময় এসব দেখলেই তিনি যেখান থেকে হোক খুঁজে পেতে শুকনো কাঠ এনে হাজির করতেন। বলতেন,—'মা, নাও এই কাঠে রান্না কর।'

পূর্বেই বলেছি মা তো তখন কূলবধূ। তখনকার সমাজে অনাত্মীয় বা অপরিচিত কোন পুরুষব্যক্তির সঙ্গে গৃহস্থ কন্যা বা বধূদের কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ছিল। কথা বলা তো দূরের কথা, তাদের মুখদর্শন, বা তাদের

সম্মুখে বাহির হওয়াও সম্পূর্ণ বর্জিত ছিল। তাই মাকে হরকুমার বাবুর দৃষ্টি সীমার মধ্যে আসতে হ'লে মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে 'আসতে হ'ত।

এদিকে হরকুমারবাবুর কিন্তু খুব ইচ্ছা যে, মা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। মার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি বলতেন,—'মা, আমার সঙ্গে কথা বল্ না। তোর আর কি চাই বল্ না মা। আমি তো তোর ছেলে।' —এই ভাবে সর্বদাই মাকে কথা বলবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন।

হরকুমার বাবুর এই জাতীয় কথাবার্তা শুনে ভোলানাথের কিন্তু খুব দুঃখ হতো। তিনি মাকে বলতেন,—'আহা, ওর যখন এত আগ্রহ, তুমি ওর সঙ্গে কথা বললেই তো পার। ও বেচারা কত কাকুতি-মিনতি করে।'

এ ছাড়া হরকুমার বাবুর আর একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল—মায়ের প্রসাদ খাওয়ার। মা খেতে বসলে প্রায়-ই তিনি এসে হাত পেতে বসে থাকতেন, বলতেন,—'মা, প্রসাদ দে না!' ভোলানাথ একথা শুনে মাকে বলতেন, —'দিলেই তো পার একটু কিছু ওর হাতে। ওর যখন এত আগ্রহ।'

সেই থেকে ভোলানাথের আদেশ নিয়ে মা হরকুমার বাবুর সঙ্গে কথাও বলতেন, প্রসাদও দিতেন।

এই হরকুমার বাবু-ই একদিন মায়ের প্রসাদ খেতে খেতে মাকে বলেছিলেন, —'মা, তুই যে কে, কেউ তো তোকে চিনল না। আজ আমি তোকে মা বলে ডাকি। দেখ্‌বি একদিন সমস্ত জগৎবাসী, তোকে মা বলে ডাকবে।'

হরকুমার বাবুর সে বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছ, আজ যদি সেই হরকুমার বাবু বেঁচে থাকতেন, মার এই বিশ্বজননীর রূপ দেখে তাঁর যে আনন্দ হ'ত, তা রাখবার ঠাঁই কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি কোথাও খুঁজে পেতেন!

আর এক ভদ্রলোক, তিনি-ও থাকতেন ঢাকাতে-ই। নাম তাঁর পার্বতী প্রসাদ। মা সিদ্ধেশ্বরীতে থাকাকালীন তিনি প্রায়-ই এসে মাকে দর্শন করে যেতেন। একদিন মা বসে আছেন, অঙ্গে তাঁর চওড়া লালপেড়ে শাড়ী, আর কপালে সিন্দূরের বড় করে এক ফোঁটা। এমনি সময়ে পার্বতী বাবু এসেছেন মার দর্শনে। তিনি এসে মার ঐ বেশ দেখে-ই ভক্তিভরে প্রণাম করে বলে উঠলেন—'এ কি দেখছি। এ তো সাক্ষাৎ জগৎজননী। মাগো! তুমি তো বিশ্বজননী, বিশ্ববাসীর মা।' বলতে বলতেই তিনি কেমন যেন ভাবস্থ হয়ে

পড়লেন। অনেকক্ষণ সেই ভাবে বসে থেকে, তারপর ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন।

যাক্ যা বলছিলাম। ধীরে ধীরে মা বিশ্বজননীর আসন গ্রহণ করছেন। কিন্তু ভক্তদের ভাবে এর প্রতিক্রিয়া বিপরীত হ'তে লাগল। কিছুদিন থেকে-ই মার হাবভাবে, কথা-বার্তায়। এ জাতীয় একটা আশঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, মা বোধ হয় আর এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে থাকতে চাইছেন না। এই অল্পপরিসর বোধ হয় মিলিয়ে যাবে বৃহত্তর পরিধির মধ্যে।

ইতিপূর্বে-ও তো মা বহুবার ঢাকা, সাহাবাগ, খেওড়া, তারাপীঠ, তারকেশ্বর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে গেছেন, কিন্তু প্রতিবার-ই যাবার সময় মা বলতেন,— 'দু একটা দিন ঘুরে আসি ; কিংবা একটা চক্কর লাগিয়ে আসি।' কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম দেখে সবার-ই চিত্তে শঙ্কিত ভাব জেগে উঠেছে।

এ শঙ্কিত ভাবের আর একটা কারণ-ও ছিল। এর-ই কিছুদিন আগে, মা শাহবাগ থাকাকালীন একটা ঘটনা ঘটেছিল। মা একবার বাইরে যাবেন। প্রফুল্ল বাবু নামক এক ভদ্রলোকের স্ত্রী সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মার সঙ্গে খুব-ই স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। সেবার মায়ের যাত্রাকালে তিনি বলেছিলেন,—'তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন কিন্তু। দেরী করলে আর ঘরে ঢুকতে দেব না, দরজা বন্ধ করে দেব।'

মা-ও হেসে সে কথার উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাই নাকি ? দরজা বন্ধ করে দেবে। আচ্ছা।'

তোমরা সবাই বুঝতে পারছ যে, ঐ কথাগুলো নেহাৎ-ই হাসি-ঠাট্টার ছলেই বলা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সবাই তাতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কারণ কোন্ কথার সূত্র ধরে কখন কি পরিণতি ঘটে, কেউ কি তা বলতে পারে। তাই মা-ও প্রায়-ই বলতেন, 'হাসি-ঠাট্টাও সংযত হয়ে-ই করতে হয়।'

যা হোক ঐ কথাটার স্মৃতি ও মায়ের হাবভাবের ব্যতিক্রম দেখে সবার-ই মনে শঙ্কা জেগে উঠেছিল যে, এবার বোধ হয় মা দীর্ঘদিনের জন্য-ই ঢাকা ত্যাগ করে বাইরে চলে যাবেন। কিন্তু অনতিবিলম্ব কালেই সে আশঙ্কা আর আশঙ্কা রইল না। সে দিন ছিল ১৩৩৯ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, মা ভোলানাথকে ডেকে পাঠালেন। ভোলানাথ উপস্থিত হ'তেই মা বললেন,

'চল কিছুদিন ঘুরে আসি।' ভোলানাথ প্রস্তুত হলেন। আর এমনি আশ্চর্য ব্যাপার, ঠিক তখন-ই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় অফিস থেকে ভাইজী-ও মার দর্শনে এসে উপস্থিত। তাঁকে আসতে দেখেই—মা বললেন,—'বাঃ ভগা তোকে-ও পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোকে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তৈরী হয়ে নে।'

ভাইজী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মার জন্যে তাঁর মনটা একটু যেন কেমন করছিল বলেই তিনি অফিস থেকেই চলে এসেছেন মার কাছে। মাকে দর্শন করে আবার ফিরে যাবেন অফিসে। অনেক কাজ-কর্ম তাঁর স্থগিত রেখে এসেছেন। আর মা বলেন কিনা, এখনই তাঁকে যেতে হবে মার সঙ্গে! আর তা ছাড়া এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও পূর্বে তাঁকে কিছু বলাও হয়নি। যেতে হলে, তার আগে যে অনেক কাজ থাকে—ছুটির বন্দোবস্ত করতে হবে, কাজকর্মের ভার বুঝিয়ে দিতে হবে। তারপর অর্থেরও তো প্রয়োজন—মা কোথায় যাবেন, কত দূরে, কিছুই যে তাঁর জানা নেই। এখন কি করা!—ভাইজী মার কথা শুনে অবনত মস্তকে এইসব ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। এরই মধ্যে মা আবার বলে বসলেন, —'ভাববার কিছুই নেই। টাকা-পয়সা এখানেই কারো কাছ থেকে সংগ্রহ করে নে। বাড়ী গিয়ে ফিরে আসার সময় তো আর নেই!'

ভাইজী দ্বিতীয় বার চমকে উঠলেন। তবে কি বাড়ীতে গিয়ে বলে আসাও চলবে না, তিনি কোথায় কত দিনের জন্যে চলে যাচ্ছেন। তাঁর যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সবই রয়েছে। তারা জানে তিনি অফিসে গেছেন, বিকেল হ'লেই ফিরে আসবেন।

ভাইজীকে তবুও নীরব থাকতে দেখে মা আবার বললেন—'কি, পারবি না?'

ভেবে দেখ, ভগবানের ওপর কতখানি নির্ভর করতে পারলে, নিজেকে তাঁর পায়ে কতখানি সমর্পণ করতে পারলে, একটি কথায়, শুধু একটি মাত্র আদেশে স্ত্রী-পুত্র, গৃহ-সংসার সমস্ত ছেড়ে দিয়ে, এক বস্ত্রে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে।

মায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে অনায়াসে বলে ফেললেন, —"আপনার আদেশ হ'লে সবই পারব।"

ভাইজীর নিকট মা যে ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবতী! স্বয়ং দুর্গা! মা যে ছিলেন তাঁর সকল সমস্যার সমাধান।

আর মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন, তার প্রত্যক্ষ দর্শন তো অনেকেই পেয়েছিলেন—তা তো তোমাদের পূর্বেই বলেছিলাম। মাকে সরস্বতী রূপে, ছিন্নমস্তা রূপে, কালী-দুর্গা-কৃষ্ণ রূপে অনেকেই দর্শন করেছেন ; কাজেই ভাইজী একবাক্যে, এক বস্ত্রে, নিঃসম্বল অবস্থায় মা ও ভোলানাথকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা হ'তে চলে গেলেন। এবার সেখানে সে সময় যারা উপস্থিত ছিল তাঁদের অবস্থা তো তোমরা কল্পনাই করতে পার। তাদের কারো মুখে আর একটি কথাও যোগালো না। শুধু অশ্রুভেজা দৃষ্টি মেলে তারা তাকিয়ে রইলো মায়ের চলে যাওয়ার পথের দিকে।

মা ঢাকা ছেড়ে তো চলেছেন, কিন্তু চলেছেন কোথায় ? সঙ্গে ভোলানাথ আর ভাইজী। আর মাকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছেন জনাকয়েক মাতৃভক্ত —যোগেশ বাবু, সুরেন বাবু, মাথুর বাবু প্রভৃতি।

ঢাকা ষ্টেশনে পৌছে মাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল,—'কোথায় যেতে হবে।'

মা কিন্তু তার উত্তর না দিয়ে, অপর প্ল্যাটফরমে-দাঁড়িয়ে-থাকা এক গাড়ীর প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে বললেন, 'ঐ যে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে ওটা যতদুর যাবে, সেখানে যাব।'

এবার তোমরাই বল, এরকম যাত্রা তোমরা কখনো দেখেছ ? জানা নেই, শোনা নেই, গাড়ীটা যেখানে যাবে, মা সেখানে যাবেন। আর ও গাড়ীটা যদি না যায় ? তোমরাও এরকম কর নাকি ?

যাক, কী আর করা যাবে। ভাইজী সংবাদ নিয়ে জানলেন গাড়ীটা যাচ্ছে 'জগন্নাথ গঞ্জ' পর্যন্ত। মাকে বলা হ'ল। মা ভাইজীকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'জগন্নাথ গঞ্জ কোথায় ?'

এ হ'ল আরেক বিপদ। 'জগন্নাথ গঞ্জ' কোথায় ? ভাইজী জানেন না। যাক্ মা বললেন, 'ও পর্যন্তই টিকেট কাটো।'

জগন্নাথ গঞ্জের টিকেট কেটে মাকে নিয়ে ভোলানাথ ও ভাইজী গাড়ীতে উঠে বসলেন। অনতিবিলম্বেই গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল। গাড়ী চলল। নীচে দাঁড়িয়ে, গভীর বেদনায় কেঁদে উঠল গুটি কয়েক ভক্তের প্রাণ। অশ্রু গোপন করতে গিয়ে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিলেন—আর গাড়ী মাকে নিয়ে ছুটতে লাগল জগন্নাথ গঞ্জের পথে।

যথাসময়ে মা জগন্নাথ গঞ্জ-ও পৌঁছালেন। এদিকে সন্ধ্যা ঘনায়মান। এখন মা যাবেন কোথায় ? কোথায় উঠবেন ?

আবার মাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'মা, এবার কোথায় ?'

মা ঠিক ঢাকা ষ্টেশনের পূর্বানুবৃত্তিই করলেন, অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দিলেন অদূরে অপেক্ষমান একটি গাড়ীকে। এবারও সংবাদ নিয়ে গাড়ীটির অন্তিম গন্তব্য স্থানের টিকেট কাটা হ'ল। গাড়ী যাবে বাংলা ছাড়িয়ে বিহারে। গাড়ী যাবে কাটিহারে।

যথাসময়ে মা কাটিহারেও পৌঁছালেন। এবারও কি সেই ভাবেই আবার যাত্রা সুরু হবে ?

এদিকে আরেক বিপদ দেখা দিল। ভাইজীর সংগৃহীত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তিনি চিন্তামগ্ন, কী করা ! মাকে বলা দরকার। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল ভাইজীর ললাটে।

মা কিন্তু ভাইজীর দিকে তাকিয়েই বোধ হয় বুঝলেন তাঁর অকথিত বক্তব্য। তিনি নীরব ভাষাতেই বোধ হয় ভাইজীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে থাকবেন, —'চিন্তা কি ? আমি তো আছি !'

বলতেও আশ্চর্য বোধ হয়—ভাইজী ভাবছেন, —'কি করি !' অকস্মাৎ ভাইজী দেখতে পেলেন, কিয়ৎ দূরেই তাঁরই এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধু প্ল্যাটফরমের অপর প্রান্ত থেকে ভাইজীর দিকেই এগিয়ে আসছেন। তিনি দূর থেকে ভাইজীকে দেখতে পেয়েই অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁরই দিকে। তোমরাই বল, হাতে স্বর্গ পাওয়া আর কাকে বলে! বন্ধুটি ভাইজীর নিকটে আসতেই, তাঁর ও ভাইজীর মধ্যে কিছু কথাবার্তা হলো। ভাইজীর বক্তব্য শুনে বন্ধু তো অবাক। তিনি বললেন, কোনদিন তিনি এত টাকা সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করেন না। ভুলবশতঃ গতকালের দোকানে পাওয়া সব টাকাই তাঁর সঙ্গে রয়ে গিয়েছে, ব্যাংকে রেখে আসা হয়নি। বলতে বলতেই তিনি তাঁর যাবতীয় অর্থই ভাইজীর হাতে তুলে দিলেন। দিয়ে বললেন, আজ তাঁর পরম ভাগ্য যে তাঁর অর্জিত অর্থে মায়ের সেবা হবে। এবং আরো বললেন, 'ভবিষ্যতে যদি আরো অর্থের প্রয়োজন হয়, ভাইজী যেন নিঃসংকোচে লেখেন। প্রয়োজন হলে পরে টাকা ফেরৎ পাঠালেই চলবে।'

বলতো কী অভাবনীয় ব্যাপার !

এরূপ কেন হয় ? কী করে হয় ? এ প্রশ্নের উত্তরে মা একবার বলেছিলেন—'তোমরা যেমন ব্যাংকে টাকা রাখ, এ শরীরেরও তেমনি সব ব্যাংকেই টাকা আছে। প্রয়োজন মত খেয়াল হ'লে তোমরাই তা তুলে দিয়ে যাও। সব যে একেরই।

যাক কাটিহারে পৌছে মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা পূর্ববৎ দেখিয়ে দিলেন একটি গাড়ী। ভাইজী এখন নিশ্চিন্ত। যথেষ্ট অর্থ এখন রয়েছে তাঁর সঙ্গে। তিনি সংবাদ নিয়ে লক্ষ্ণৌ-এর তিন-খানা টিকেট কেটে নিলেন। সে গাড়ী যাবে লক্ষ্ণৌ—উত্তর প্রদেশের (তৎকালীন নাম ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ অব আগ্রা এণ্ড অবধ) রাজধানী পর্যন্ত।

মা লক্ষ্ণৌ এসেছেন। এবার কোথায় যাওয়া ? লীলাময়ী মায়ের লীলার তো আর শেষ নেই। এও যেন এক মজার খেলা। এক গাড়ী থেকে নেমে সম্মুখে যে গাড়ী পাওয়া যাবে, সেটা যেন তাঁর জন্যে-ই অপেক্ষা করে আছে। এবার-ও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। অদূরে গমনোন্মুখ দেরাদূন এক্সপ্রেস-এর প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করতে-ই ভাইজী দেরাদূনের টিকিট কেটে উঠে বসলেন গাড়ীতে। গাড়ী ছুটল হু হু করে দেরাদূনের পথে।

একবার ভেবে দেখ, কোথায় ঢাকা আর কোথায় হিমালয়ের গা ঘেঁষা সহর দেরাদূন। অদ্ভুত না মায়ের খেয়াল ! অথচ মার এরূপ খেয়ালের কোন কারণ-ই খুঁজে পাওয়া যায় না। মাকে জিজ্ঞাসা করলে-ও মা নীরব থাকেন। বড় জোর কখনো একটু হেসে বলেন,—'এত বাঁধনহারা পাখী। কখন কোথায় উড়ে চলে যায় কে জানে ! তার আবার কারণ অকারণ কী !'

মার এ উত্তর শুনে কবির কবিতার দুটি লাইন-ই মনে পড়ে। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না—

"এই বাসা ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে –
কোন পার হ'তে কোন পারে !"—মার বক্তব্য-ও যেন তাই।

যাক্ মা দেরাদূন পৌঁচেছেন। ভাইজী, মা ও ভোলানাথকে নিয়ে মার নির্দেশানুযায়ী চলে গেলেন দেরাদূন শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে, পাহাড়ের গা-ঘেঁষা একটি গ্রামে। গ্রামটির নাম রায়পুর। সেখানে বহুকালের, বহু প্রাচীন একটি শিব মন্দির আছে। সোজা সেই মন্দিরে-ই চলে গেলেন তাঁরা। আশ্চর্য

ব্যাপার। মায়ের হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলনে তখন মনে হচ্ছিল যেন এসব স্থান মায়ের পূর্ব-পরিচিত। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, মাঠ-ময়দান কোথায় কী আছে যেন তাঁর সব-ই জানা, অথচ দেরাদুন আসা তো মায়ের এই প্রথম।

মন্দিরে ঢুকে সবাই দেখল সেটি একটি শিব মন্দির। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন মন্দিরাভ্যন্তরে। কিন্তু মন্দিরের অবস্থা একেবারে-ই জরাজীর্ণ। দেয়ালগুলো ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে অশ্বত্থ-বটের চারা। আশেপাশে চতুর্দিক জঙ্গলাকীর্ণ। সে জঙ্গলে সাপ আর বিচ্ছুর রাজত্ব।

মার কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপও নেই। সেই মন্দিরের নিকটবর্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রায় ধ্বসে পড়া কয়েকটি কুটিয়া-ও রয়েছে। দেখে মনে হয় কোন যুগে সেখানে এই মন্দিরের পূজারী ও সেবাইতগণ থাকতেন, আর না হয় হয়ত সাধু মহাত্মারা তাঁদের সাধন কুটির বেঁধেছিলেন এইখানে। তাঁরা বহুদিন তা ত্যাগ করে চলে গেছেন। শুধু তাঁদের স্মৃতি নিয়ে এই ধ্বংসাবশেষগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেই কথা বলার জন্যে-ই।

যাক্ ভাইজী ক্ষিপ্রগতিতে কয়েকটি কুটিয়ার ঝাড়জঙ্গল থামছে, হিঁচড়ে টেনে তুলে ফেলেন। বিচ্ছু সাপ বোধ হয় মানুষের সাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক সরে গেল। মায়ের আদেশে স্থির হ'ল এখন কিছুদিন ওখানেই তাদের বাস।

'বাস' তো হলো। কিন্তু বাস করতে হলে মানুষের কতগুলি ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন খেতে না পেলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? জল ছাড়া কি কেউ থাকতে পারে? আর রাতের অন্ধকারে, সেই সাপ-বিচ্ছুর দেশে আলোর-ও তো প্রয়োজন। সেখানে যে কিছু-ই নেই।

তোমরা হয়ত বলবে, কেন? মায়ের খাওয়া-দাওয়ার রকমসকম তো আমাদের জানাই আছে। একটা চাল প্রতিদিন খেয়ে যিনি মাসের পর মাস কাটাতে পেরেছেন, এক চামচ জল জিভে দিয়ে-ও যাঁর কেটে গেছে দিনের পর দিন, তাঁর পক্ষে এখানে থাকা আর এমন কি কঠিন ব্যাপার! বেশ তাঁর কথা না হয় মেনেই নেওয়া গেল, কিন্তু সঙ্গে তো আর-ও দুজন লোক আছেন, তাঁদের ব্যবস্থটা-ও তো হওয়া দরকার।

কিন্তু মায়ের খেয়ালে সব ব্যবস্থাটা-ই তাঁরা করে নিলেন।

কি ব্যবস্থা শুনবে?

রাতের অন্ধকারে আলোর প্রয়োজন হ'লেই ভাইজী শুকনো কয়েকটি পাতা জ্বালিয়ে দিতেন। ব্যস্ আর কি চাই—চক্ষের পলকে ঘর আলোকিত হয়ে উঠত। অবশ্য চক্ষের পলকে তা নিভে-ও যেত। তবু-ও ঐ সময়ের মধ্যে-ই তাঁরা কাজ চালিয়ে নিতেন। আর রায়পুর গ্রাম তো। দূরে দূরে ছড়ানো পাহাড়িয়াদের ঘরবাড়ী আছে-ই। ভাইজী হাত পেতে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনতেন আলু, নুন, আটা, চাল। আর পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরণার জল ছিল তাঁদের কাছে-ই। তা থেকে-ই সংগৃহীত হ'ত পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জল। ব্যস্ আর কি চাই। পাহাড়ে ইতস্ততঃ ছড়ানো পাথর থেকে, দু টুকরো পাথর বসিয়ে, তার মধ্যে শুকনো কয়েকটা পাতা গুঁজে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে চাল আর আলু সেদ্ধ করে নিলেই তো হয়ে গেল। সুতরাং অভাব আর কিছুরই রইল না। খাওয়া-দাওয়া, জল, আলো সব ব্যবস্থাই একেবারে পাকা।

অবশ্য ভাইজীর জীবনে ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা বলতে এছাড়াও আরো একটু কিছু ছিল। তা হ'ল সেই প্রয়োজনীয়তা যাঁর তাগিদে পড়েই আজ তিনি অফিস ফেরতা বাড়ী না গিয়ে, গৃহসংসার ত্যাগ করে এতদূর আসতে বাধ্য হয়েছেন। সেটি কি? সেটি মাতৃ-সঙ্গ। এখানে এসে ভাইজীর সে প্রয়োজনীয়তা মেটাবার অখণ্ড অবসর মিলেছে। কথায় বলে, মানুষ কি কেবল অন্ন খেয়েই বাঁচে? মানুষের জীবনে অন্নের চেয়েও অনেক বড় প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে প্রয়োজনীয়তা না মিটলে, মানুষ, মানুষ হয়ে বাঁচতে পারে না। ভাইজী আজ তা পেয়ে কৃতকৃতার্থ। অখণ্ড মাতৃসৎসঙ্গের সুযোগ পেয়ে আজ তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন।

আর ভোলানাথ? ভোলানাথের-ও সেই কথা। উত্তরাখণ্ডের পুণ্যভূমিতে তিনি এই নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার সুযোগকে মন-প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরলেন।

মা-ও বেশ আছেন আপন ভাবে!

কিন্তু বনে যখন ফুল ফোটে, মানুষ না জানলেও তার সুগন্ধ সৌরভ বাতাসে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে দিক-দিগন্ত জুড়ে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হ'ল না। সমগ্র রায়পুর গ্রামে তো বটে-ই, এমন কি দূর-নিকট অন্যান্য গ্রাম-গঞ্জেও সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, রায়পুরেয় পুরানো শিবমন্দিরে কে এক যোগিনী বসবাস করছেন—অপূর্ব তাঁর মহিমা, অবর্ণনীয় তাঁর জ্যোতি মাধুরী।

এইবার মাটিতে কোপ পড়ল। গ্রাম-গঞ্জ উজাড় করে দিয়ে, দিক-বিদিকের লোক দলে দলে আসতে আরম্ভ করল গণ্ডগ্রাম রায়পুরের জঙ্গলে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যে পেরিয়ে প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ করল জনতার স্রোত। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী আসতে লাগল অনর্গল ভাবে। যে জঙ্গলে কালে ভদ্রে লোকের দেখা মিলত, এখন তা জনতার কোলাহলে অহর্নিশি মুখরিত হ'তে লাগল। দেখতে দেখতে কোথায় চলে গেল সে জঙ্গলের ঝোপঝাড়, কোথায় মিলিয়ে গেল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লতাগুল্মের রাশি, পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে গড়ে উঠতে লাগল। আর কায়েমী রাজত্ব গড়ে তুলেছিল যারা, সেই সাপ আর বিচ্ছুও কোথায় যে আত্মগোপন করল, তার হদিস-ই পাওয়া গেল না। দেখতে দেখতে রায়পুর এক তপোবনে রূপায়িত হয়ে উঠল।

মা কিন্তু তাঁর অখণ্ড ভাবঘন মূর্তিতে সেখানেই বিরাজিত রইলেন। লোকেরা আসে, মাকে দেখে, মায়ের কাছে বসে। মা যখন তাঁর চুড়াবাঁধা কেশগুচ্ছসহ-মাথাটি দক্ষিণে বা বামে হেলিয়ে তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দেন, বা মৃদু হেসে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন, ওরা সব আত্মহারা হয়ে অপলক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা ভাবে এত স্নেহ, এত করুণা কি এক অঙ্গে ধরতে পারে? ওরা বুঝতে পারে না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, মাকে ছেড়ে যেতে ওদের মন কেমন করে। যেতে ইচ্ছে করে না। তবুও যেতে হয়। প্রণাম করে অশ্রু ছলছল চোখে বলে, 'মাতাজী, কাল বহুত জলদী বুলা লেনা।' ('দেরী কোরো না, তাড়াতাড়ি ডেকে এনো।')

আর ভাইজী মায়ের ঘরের বাইরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন হাতজোড় করে, যদি মার কোন প্রয়োজন হয়।

এ যেমন এক দিক হ'ল, ঠিক তেমনি ভাইজীর ঐরূপ নিরীহ বিনম্র দাস্য ভাবকে লক্ষ্য করে জনমনে আর একটি কাহিনী গড়ে উঠল। সে কাহিনীটি বড় মজার। মার কানে সে কাহিনী পৌঁছাতে মা তো হেসেই আকুল।

ব্যাপারটি হ'ল এই যে ভাইজীর বিনম্র দাস্যভাবকে লক্ষ্য করে আগন্তুক জনতার মধ্যে কারো কারো এই ধারণা হ'ল যে ভোলানাথ আর মাতাজী—ওঁরা পতিপত্নী, আর ভাইজী ওঁদের গৃহভৃত্য। ভোলানাথের সংসারের প্রতি

বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে তিনি উদাসীন হয়ে সংসার ত্যাগ করে সাধন-ভজনের জন্য পালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু বধূটি নাছোড়বান্দা। তিনি তাঁর স্বামীকে সংসার ত্যাগ করে কখনই আসতে দেবেন না। অনেক চেষ্টা করেও বধূটি যখন স্বামীর মন সংসারে বসাতে পারলেন না, তখন তিনি নিজেই স্বামীর সঙ্গে বৈরাগিনীর বেশে বেরিয়ে এসেছেন আর আসার সময় তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গৃহভৃত্যটিকেও। কিন্তু তাঁদের এ ভ্রান্তি বেশী দিন স্থায়ী হ'তে পারল না। কেন জান? কারণ,—পূর্বে-ই বলেছি যে ভাইজী ছিলেন তৎকালীন ইংরেজ আমলে কৃষিবিভাগে সাব ডিভিসনেল অফিসার—অর্থাৎ সরকারী পদমর্যাদায় মস্ত বড় গণ্যমান্য এক ব্যক্তি। তিনি এখানে চলে এসেছেন, তাই তাঁর কাছে সরকারী দপ্তর থেকে বিভিন্ন কাগজপত্রও আসতে আরম্ভ করেছে। স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টার তাঁর নামাঙ্কিত সেই সব চিঠিপত্র ও তাঁর নামের শেষে যুক্ত পদবী দেখে তো অবাক! কখনো কখনো তিনি নিজেই ভাইজীর সব চিঠিপত্র নিয়ে এসে সম্ভ্রমে তাঁকে দিয়ে যেতেন। ক্রমে তাঁর কাছ থেকেই সংবাদ পেয়ে পূর্বোক্ত কাহিনী যে কপোলকল্পিত, তা তারা বুঝতে পেরেছিল।

ঠিক এ জাতীয়, এর চেয়েও আরো মজার আর একটি ঘটনা-ও এখানেই ঘটেছিল।

একবার ভাইজীর নামে সরকারী দপ্তর থেকে এক হাজার টাকার একটি মনি অর্ডার আসে। যথারীতি সেই মনি অর্ডারের টাকা বিতরণের জন্য পোষ্টম্যান গ্রামে নিয়ে আসে। প্রথমতঃ তো পোষ্টম্যান ধারণাই করতে পারে নি যে, সরকারী দপ্তরের অতবড় অফিসার এই গণ্ডগ্রামে কেউ থাকতে পারে। তবুও অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর পোষ্টম্যান এসে উপস্থিত হ'ল রায়পুরের সেই শিবমন্দিরে। সেখানে 'জ্যোতিষবাবু' 'জ্যোতিষবাবু' বলে বার কয়েক ডাকার পর ভাইজী বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন ব্যাপার কী? পোষ্টম্যান জানাল, জ্যোতিষচন্দ্র রায়, এস-ডি-ও-র এক মনি অর্ডার আছে। তাঁকে চাই।

ভাইজী বললেন,—'দিন, আমার-ই নাম……।' পোষ্টম্যান, 'আমার-ই নাম' কথা দুটি শুনেই চরম বিস্ময়ে, আর বাকী কথাগুলো বোধ হয় শুনতেই পেলো না। সে তবু বারকয়েক ভাইজীর আপাদমস্তক বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল,—আর চকিত স্বরে বলল, 'তুমি-ই জ্যোতিষচন্দ্র রায়? তা দেখ, ডাকখানা থেকেই তুমি

নিয়ে এস সে টাকা—সে টাকা এখানে দেওয়া যাবে না।' আসল কথা, সে বিশ্বাস-ই করতে পারল না যে, হাঁটুর ওপর কাপড় পরা, উলঙ্গ দেহের এই লোকটা এস-ডি-ও। বলেই আর কালবিলম্ব না করে সে প্রস্থান করল।

যথাসময়ে ভাইজী পোষ্ট অফিসে উপস্থিত হয়ে সে টাকাটা নিয়ে এলেন। পোষ্টমাষ্টার পোষ্টম্যানের ঐরূপ ব্যবহারের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তবু-ও, এ না হয় বিদেশে, অপরিচিত স্থানের ব্যাপার। কিন্তু ভাইজী এত সহজ, সরল ও নরম হয়ে থাকতেন যে, তাঁরই স্বস্থান ঢাকাতেও এ জাতীয় ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে।

একবার মা সিদ্ধেশ্বরীতে আছেন। সে ১৩৩৪ সনের কথা। ভক্তদের সিদ্ধান্তক্রমে সেবার-ই প্রথম মার জন্মোৎসব ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে। সে উপলক্ষ্যে মায়ের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই সেখানে উপস্থিত। আর উৎসবের কর্মকর্তাদের মধ্যে ভাইজী-ও একজন।

উৎসব সুরু হয়ে গেছে, উৎসবের নানান কাজে ভাইজীকে ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক যাতায়াত করতে হচ্ছে। সে সময় ২০৷২২ বছরের একটি নবাগত যুবক ভাইজীকে ডেকে ডেকে বলছে—'ভাই তুমি এ কাজটি কর, ও কাজটি কর।' সে ভাইজীকে চেনে না। আর ভাইজীর পোষাকপরিচ্ছদও এত সাধারণ পর্যায়ের যে, সে তাঁকে সেস্থানের কারো গৃহভৃত্য-ই ভেবেছে।

ইতিমধ্যে সেই যুবকটির পিতাও সেস্থানে কার্যোপলক্ষে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি মাতৃভক্তদের মধ্যেই একজন এবং তিনি ভাইজীরই অধীনস্থ কর্মচারী। তিনি তো উপস্থিত হয়ে-ই তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়েছেন এবং পুত্রকে-ও বলেছেন তাঁকে নমস্কার করতে। পিতার আদেশে সে ভাইজীকে নমস্কার করে-ই একবারে দৌড়। বুঝতে-ই পারছ পরে সে যখন জেনেছিল যে, তাঁর আদেশ পালন করা লোকটি কারো গৃহভৃত্য নয়, তারই পিতার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তখন সে কতখানি লজ্জিত হয়ে থাকবে। ভাইজী ছিলেন এমন-ই সহজ সরল মানুষ।

যাক্ সে কথা! দিন গড়াতে লাগল। রায়পুর এখন এক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। নবাগত যোগিনীর অলৌকিক কার্যকলাপ ও স্নেহ-সুষমার কথা ক্রমে রায়পুর ছাড়িয়ে দেরাদুন, দেরাদুন ছাড়িয়ে মুসুরীর পার্বত্য অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে

পড়তে লাগল। ঢাকাতে যেমন মায়ের ভক্ত পরিবার ক্রমবর্ধমান হয়ে পড়ছিল, এই সুদূর অজানা-অচেনা দেশে এসে-ও তার-ই পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল। ভাবলে আশ্চর্য-ই বোধ হয় জঙ্গলাকীর্ণ, অবহেলিত, অজ্ঞাত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম শত শত লোকের নিকট হয়ে উঠল এক মহাতীর্থস্থল।

মহাতীর্থ তো হ'ল। কিন্তু মাকে কী আর সে ধরে রাখতে পারল? কয়েকটা দিন রায়পুরে বেশ কেটে গেল। মা, ভাইজী, ভোলানাথ সকলের প্রতি-ই জনগণের শ্রদ্ধা-ভক্তির সীমা নেই। ভাইজীর পরিচয়-ও এখন বদলে গেছে। সবাই ভাইজীকে মায়ের ধর্ম-পুত্র বলেই জেনে নিল। বেশ ছিলেন তাঁরা, কিন্তু মা তো বিশ্বধাত্রী, জগৎজননী। তাঁকে কি আর ক্ষুদ্রত্ব, খণ্ডত্ব ধরে রাখতে পারে! তাঁকে যে,

"আকাশের প্রতি তারা টানিছে তাহাকে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।"

সেই টানে-ই একদিন মা বেরিয়ে পড়লেন বৃহত্তর বিশ্বের দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, সহরে, বন্দরে। মায়ের সেই চলার খেয়ালে কত যে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ তার শেষ নেই। সে চলার পথে কত শত লুপ্ত তীর্থ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কত গণ্যমান্য দেশবরেণ্য ব্যক্তি মায়ের সংস্পর্শে এসে ধন্য হলেন, মায়ের দর্শন ও উপদেশ পেয়ে কত লোকের জীবন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল, তার কোন সংখ্যা নেই। এবার তার কয়েকটি মাত্র তোমাদের শোনাচ্ছি।

একবার মা গিয়েছেন পার্বত্য নিবাস আলমোড়া সহরে। সেখানে একদিন মা পাহাড়িয়া পথে পাদচারণা করছেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, অল্প বয়স্ক একটি বালক দূরে দাঁড়িয়ে মার দিকে তাকিয়ে আছে। মার কি খেয়াল হ'ল, মা হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু কোথায় সেই বালক? কেউ নেই। তবু-ও মা আপন ভাবেই একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে পড়লেন। সঙ্গীয় ভক্তরা-ও এদিকওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ল। হঠাৎ মা দেখতে পেলেন নিকটস্থ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি লোক চলে গেল। মা বললেন, 'দেখলাম, একটি লোক, মাথায় জটা, পিঠে তার ঝুলে পড়েছে দুটি সাপ,

হাতে একটি ত্রিশূল ঐ দিক দিয়ে চলে গেল। লোকটির শরীর বরফের মত গৌরবর্ণ।' মার কথা শুনে সবাই সেদিকে তাকাল, কিন্তু কেউ কিছুই দেখতে পেল না।

ইতিমধ্যে মা ও ভক্তদের সেখানে উপবিষ্ট দেখে স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত। তাদের নিকটে শোনা গেল, অনেক পূর্বে এখানে এক বিশালকায় শিবমন্দির ছিল। পরে কালক্রমে তা খণ্ডহরে পরিণত হয়ে গেছে। আর ঐ যে মা বিশালকার প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে আছেন, তা সেই বিধ্বস্ত মন্দিরের-ই একটি ভগ্নাবশেষ।

পরবর্তী কালে মায়ের খেয়ালে সে মন্দির পুনঃনির্মিত হয়েছে। আজো সে মন্দির সে স্থানেই সগৌরবে বিদ্যমান।

আর একবার মা চলেছেন উত্তরপ্রদেশের এক গ্রাম্য পথে। পথপার্শ্বে মহামারীর অত্যাচারে প্রায় জনশূন্য, পরিত্যক্ত একটি গ্রাম। মায়ের কি খেয়াল হলো মা সেই অঞ্চলের একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় কিছুক্ষণ বসে চলে এলেন। ফেরার পথে মা আপন মনেই বললেন,—'গ্রামটা বড় খালি খালি।'

পরে শোনা গেল, মহামারীর প্রকোপে যে গ্রাম দীর্ঘদিন জন-পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল, মায়ের পাদস্পর্শে তা আবার জনবসতি পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন সে গ্রাম শস্য, ফসলে, ফল ও পুষ্পদলে হাসছে।

মা চলেছেন বেরেলির গ্রাম্য পথে। বেরিলি উত্তরপ্রদেশের একটি সহর। চলার পথে হঠাৎ মা মোটর থামিয়ে নেমে এগিয়ে গেলেন পথ পার্শ্বস্থিত দুটি বিশালকায় মহীরুহের দিকে। মার আপন খেয়ালে মা বৃক্ষ দুটিকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে ফিরে এসে তিনি তাঁর গন্তব্য পথে চলে গেলেন। ব্যাপারটি যে কী, তখন তার কিছুই বোঝা গেল না।

পরে সংবাদ দিয়ে জানতে পারা গিয়েছিল, প্রতিদিন মধ্য রাত্রে সেই বৃক্ষচূড়া থেকে করুণ রমণীকণ্ঠে বিলাপধ্বনি শোনা যেতো। কোন রমণী নাকি তার বৃক্ষশাখাতে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। মায়ের স্পর্শ পাবার পর থেকে আর সে ক্রন্দনধ্বনি কখনো শোনা যায় নি।

মার মোটর চলেছে, নদীতটবর্তী একটি পথ দিয়ে। পথপার্শ্বে ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম্য অঞ্চল। প্রায় প্রতি বৎসর-ই নাকি বর্ষার দিনে ঐ নদীর প্লাবনে গ্রাম

জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তখন গ্রামে রোগ-শোকের ছড়াছড়ি পড়ে যায়। এবং প্রতি বৎসর গবাদি পশু ও বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাকে কিন্তু এসব কথা কখনো বলা হয় নি। চলতে চলতে নিজের খেয়ালেই মা মোটর থামিয়ে নেমেছেন। উদ্দেশ্য ঐ গ্রামের পথপার্শ্বস্থ একটি বৃক্ষের নীচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন।

এ দিকে মা এসেছেন। মায়ের আগমন সংবাদে বহু গ্রামবাসী তথায় একত্রিত হয়ে গেল। তারা মাকে চেনে, কেউই ইতিপূর্বে দর্শন-ও করেছে। মাকে নিয়ে তারা দলবদ্ধ হয়ে তাদের বর্ষাদিনের দুঃখ-দুর্দশার কথা মায়ের কাছে নিবেদন করলো।

যথাসময়ে মা তো চলে গেলেন। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল ক্রমে ক্রমে সে নদীর গতিপথের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার ধারাপথ বর্তমানে গ্রাম থেকে যথেষ্ট দূরবর্তী।

আর একবার মা চলেছেন জৌনপুর সহরের মধ্য দিয়ে। হঠাৎ মা গাড়ী থামিয়ে উপস্থিত হলেন এক ভদ্রলোকের গৃহের সম্মুখে। গৃহের বদ্ধ প্রবেশ দ্বারে আঘাত করতেই দরজা খুলে দিল অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে। এরা মায়ের-ই এক ভক্ত পরিবার। মেয়েটি দরজার সম্মুখে মাকে দেখে-ই দৌড়ে গিয়ে তার মাকে সংবাদ দিয়েছে,—'মা, জয়মা এসেছে।' এরা মাকে 'জয়মা' বলে সম্বোধন করত।

সংবাদ পেয়ে গৃহস্বামিনী তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

এদিকে ব্যাপার হয়েছে কি? ঐ গৃহের গৃহস্বামী ঐ বধূটির পতি। মরণাপন্ন অবস্থায় কিছুদিন ধরে রোগশয্যায় পড়ে আছেন। মাকে এরূপ অভাবিত ভাবে পেয়ে বধূটি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে উঠল,—'মা গো, আমার স্বামীকে বাঁচাও।' বলতে বলতেই সে মায়ের চরণতলায় লুটিয়ে পড়ল। মার সঙ্গীরা তো কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অথচ মার ভাবখানা ঠিক তার বিপরীত। অত্যন্ত সহজ শান্ত ভাব। যেন মা সব জেনে শুনেই এখানে এসেছেন।

মায়ের নির্দেশে বধূটির চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল। বৌটি উঠে বসে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'মা ঘরে চল। আমার স্বামীকে একটু দেখে যাও।'

এদিকে মা তো কোনো গৃহস্থ বাড়ীতে প্রবেশ করবেন না। এখন কি করা যায়? বধূটির করুণ মিনতিতে মায়ের সঙ্গীয় সকলের সাহায্যে খাটে শায়িত অবস্থাতেই সেই মুমূর্ষু রোগীকে মায়ের সম্মুখে আনা হ'ল। মা তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সেই রুগীর দুচোখেও তখন অশ্রুধারা। মা তার হাতে দুটো ফল দিয়ে বললেন, 'মা, বাবা, এবার আসি?'

মা চলে গেলেন। পরে বধূটির চিঠিতে জানা গিয়েছিল সে যাত্রা সে রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

আর একবার মৃজাপুর জেলার বিন্ধ্যাচলের অষ্টভূজা পর্বতে মা এলেন। মায়ের আগমন সংবাদ পেয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তৎকালীন স্থানীয় জেলা মেজিষ্ট্রেট। তিনি বহু দিন ধরে-ই মায়ের কাছে আসা-যাওয়া করেন। সেবার তিনি এসে মাকে প্রণাম করতে-ই মা বিনা-ভূমিকায় তাঁকে নিয়ে সে আশ্রমের বারান্দায় এসে অঙ্গুলি সংকেতে অদূরস্থিত একটি জমি দেখিয়ে বললেন,—'বাবা, এ শরীরের খেয়াল ঐ জমির নীচে অনেক দেবদেবীর বিগ্রহ চাপা পড়ে আছে। তুমি ওদের তুলে আনতে পার?'

মায়ের আদেশ। সঙ্গে সঙ্গে-ই তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।

দ্বিতীয় দিনে-ই শুরু হয়ে গেলো সে স্থানের খনন কার্য। কিন্তু কৈ, কোন বিগ্রহমূর্তি তো সেখানে নেই।

জেলা মেজিষ্ট্রেট মাকে সে কথা জানাতেই মা বললেন, 'বাবা ওরা ওখানেই আছে। এই শরীরটার কাছে ওরা এসেছিল। আরো একটু খুঁড়ে দেখতে বলো না।'

আশ্চর্য, তোমরা শুনলে অবাক হবে, আরো কিছুটা খোঁড়ার পরে-ই সেখানে আবিষ্কৃত হ'ল বহু প্রাচীন, বহু দেবদেবীর অনেক প্রস্তরমূর্তি। সবাই অবাক, কী করে মা জানলেন ওখানে সব মূর্তি আছে?

এই ভাবে মায়ের চলার পথে এ জাতীয় শত শত ঘটনা ঘটে গেছে। তোমরা যখন বড় হয়ে মায়ের বিস্তারিত জীবনী পড়বে, তখন দেখবে মার লীলা কাহিনী কী বিচিত্র!

তারপর মায়ের এই চলার পথেই একদিন যখন মা দেরাদূনে আনন্দচক নামক স্থানে নিবাস করেছিলেন, সেই সময়-ই আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহধর্মিণী শ্রীমতী কমলা নেহেরু মায়ের দর্শনে এসে উপস্থিত। মাকে দেখে-ই তিনি দ্রুত পদক্ষেপে একেবারে মায়ের কাছে গিয়ে প্রায় মায়ের গা ঘেঁসে-ই বসে পড়লেন এবং মার সঙ্গে তাঁর একটু স্পর্শ হতেই তিনি যেন কেমন ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর সর্বাঙ্গ আনন্দ শিহরণে মুহুর্মুহুঃ কাঁপতে লাগল। দেখতে দেখতে তিনি যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। সেই ভাবেই মিনিট কয়েক থেকে তিনি দৃষ্টি মেলে মায়ের দিকে তাকালেন।—মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আবার সেই অবস্থা। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁর সঙ্গীসাথী তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন। মার নিকট হতে ওঠার সময় তিনি বললেন,—'মার কাছে সর্বক্ষণ এক আনন্দধারা বইছে। সে ধারায় একবার পড়ে গেলে উঠে আসা কঠিন।'

আর একবার মা গিয়েছেন ওয়ার্ধাতে। তোমরা জান ওয়ার্ধাতে-ই আমাদের রাষ্ট্রপিতা গান্ধীজীর সেবাগ্রাম। মা ওয়ার্ধা এসেছেন, সে সংবাদ পেয়েই গান্ধীজী লোক পাঠিয়ে দিলেন মায়ের কাছে, মাকে তাঁর সেবাগ্রামে নিয়ে যাবার জন্যে।

মা তো এলেন সেবাগ্রামে। সেবাগ্রামে উপস্থিত হয়ে-ই মা বললেন, 'পিতাজী তোমার ছোট্ট বাচ্চাকে ডেকেছ, সে এসেছে।' মাকে দেখে গান্ধীজীর যে কি আনন্দ! মাকে বসিয়ে কী ভাবে যে তাঁর সেবাযত্ন করলে তিনি তৃপ্ত হবেন, গান্ধীজী যেন তা বুঝেই উঠতে পারছিলেন না।

যা হোক তাঁদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হ'ল। অনেক হাসি আনন্দ হ'ল। তারপর মা যখন বিদায় চাইলেন, তখন গান্ধীজী বললেন—'তুমি এ কি বলছ মা? তুমি আজ এলে আজই চলে যাবে। পিতাজীর কাছে এই ছোট্ট মেয়েটা অন্তত একটা দিনও তো থাকবে?'

এই জাতীয় আরো নানান কথা বলে, তিনি মাকে সেদিন সেখানেই রেখে দিলেন। শিশুর মত মায়ের কোলে মাথা রেখে তিনি শুয়ে রইলেন কতক্ষণ! সে সময় মার সে কি ভাব! তখন মায়ের মধ্যে যে বাৎসল্যের প্রকাশ দেখা গেছে, তা মায়ের সঙ্গীদের নিকট অবিস্মরণীয়!

আর একবার মায়ের নিকট এসে উপস্থিত হলেন আমাদের বিশ্ববরেণ্য নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বোস। মাকে দর্শন করে তিনি অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়ে

অনিমেষ দৃষ্টিতে মাকে দেখতে লাগলেন। মা তাঁকে স্নেহের স্বরে বললেন,—'বাবা, তুমি তো খুব সুন্দর বলতে পার। কিছু বল না আমরা শুনি।'

নেতাজী বললেন,—'মা, আমি কি এখানে বলতে এসেছি? আমি তো শুনতে এসেছি। আমি তোমার কথা শুনব। তুমি কিছু বল।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নেতাজী মাকে একটি প্রশ্ন করলেন। মাও তার উত্তর দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। মায়ের কথাবার্তা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। যাবার সময় বলে গেলেন,—'আজ বহুদিন ধরে মার নাম শুনে আসছি। মার কথা শুনে মাকে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। আজ আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল।'

স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদজী একবার এলেন মায়ের দিল্লীস্থিত আশ্রমে। মাকে দর্শন করে তিনি অত্যধিক ভাব-বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি মাকে বললেন,—'মা, রাষ্ট্রপতিভবনে, তোমার পদধূলি একবার দিতেই হবে। আমার এ আকাঙ্ক্ষা, মা তুমি পূর্ণ করে দাও মা।'

মা তো ভাবগ্রাহী। কারো ভাব তিনি নষ্ট করেন না। সঙ্গে সঙ্গেই মা স্বীকৃতি দিয়ে বললেন,—'কখন যাওয়া হবে, ওদের সঙ্গে কথা কয়ে স্থির করে নাও পিতাজী। ছোট্ট মেয়েটা বাবার কাছে তো যাবেই।' বলেই তিনি উপস্থিত ভক্তদের দেখিয়ে দিলেন। মার রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবার সময় স্থিরীকৃত হয়ে গেল। যথাসময়ে শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদজী তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেখিয়ে মাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদজীর সে কি আনন্দ!

পরে তিনি মায়ের ভক্তদের কাছে বলেছিলেন, 'আমার জীবন ধন্য হ'ল। আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে মাকে নিয়ে এসেছি, অবশ্য এটা মায়েরই করুণা। আমার প্রার্থনা তিনি স্বীকার করেছেন, এটা আমার জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যের ফল।'

এই ভাবেই ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের বহু গণ্যমান্য, বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ, রাষ্ট্রনেতা, সাধু-সন্ন্যাসী, ধর্মযাজক, বৈজ্ঞানিক, সাধক, বিদগ্ধ পণ্ডিত মার কাছে

এসেছেন, মাকে দর্শন করেছেন, মার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যাবার সময় বলে গেছেন,—'এমনটি আর দেখিনি, এমনটি আর হয় নি।'

এইভাবে দেশ-বিদেশে পর্যটনের পর এবার মা পা বাড়ালেন কৈলাশের পথে। সেদিন ছিল ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন, রবিবার।

কৈলাশ-যাত্রা যে কত কঠিন, আশা করি তা তোমাদের কিছু কিছু জানা-ই আছে। কৈলাশের পথে মা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন গুটিকয়েক লোক—তাঁদের মধ্যে ভোলানাথ, ভাইজী, গুরুপ্রিয়া দেবী তো আছেন-ই। একটি পার্বত্য, মেয়ে—নাম তার পার্বতী, সে-ও মার সঙ্গী হ'ল। যাত্রা শুরু হ'ল শৈলনিবাস আলমোড়া থেকে। পথ অত্যন্ত দুর্গম, মা চলেছেন দাণ্ডীতে। দাণ্ডী এক জাতীয় খোলা পাল্কীর মত। আর অন্যরা চলেছেন পায়ে হেঁটেই। অবশ্য সঙ্গে আরো দাণ্ডী আছে। প্রয়োজন হলে অন্যে-ও তার সাহায্য নিতে পারবে।

যাক্ মা চলেছেন। পথের দু পাশে পাহাড়ী ছোট ছোট গ্রাম। মার দাণ্ডী যাচ্ছে—গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে পথের দু ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। একটা গ্রাম পেরিয়ে যায়, আবার একটা গ্রাম আসে, সেটাও পেছনে সরে যায়, আবার অন্যটা এগিয়ে আসে। এই ভাবেই দিনের পর দিন কত দুরারোহ পর্বত, কত তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ, কত নদী-নালা-ঝরণা, কত ঘন পার্বত্য বন-জঙ্গল অতিক্রম করে মা এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গীদের উৎসাহ-আনন্দেরও সীমা নেই। যেখানে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, সেখানেই তাঁবু ফেলা হয়। ডেরা-ডাণ্ডা সব সঙ্গেই আছে। এইভাবে চলতে চলতে মা এসে উপস্থিত হলেন এক পার্বত্য হিন্দুরাজ্য অস্কোটে।

অস্কোটের রাজা পূর্বেও মাকে আলমোড়াতে দর্শন করেছেন। মা আসছেন এ সংবাদ পেয়েই রাজ্য-মন্ত্রী তার সভাসদবৃন্দকে নিয়ে দাণ্ডী, পাল্কী, লোক-লস্কর সব নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে মাকে স্বাগত জানাবার জন্যে এসে উপস্থিত। রাজা সে সময় রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন না, রাজকার্যে তিনি গিয়েছিলেন অন্যত্র। তাই তাঁর প্রতিনিধি হয়ে মন্ত্রী এসেছেন।

কি অদ্ভুত এদের ভক্তি-শ্রদ্ধা! মার কাছে এসেই দলবেঁধে একসঙ্গে সবাই সটান লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে মাকে প্রণাম জানালো। তারপরে উঠে নিজেদের দুই কানে হাত দিয়ে মার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী মশায় ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—'মা, মাগো. তুমি এসেছ। রাজা-

বাহাদুর রাজ্যে নেই। তোমাকে আমরা কোথায় বসাব, কোথায় রাখব। আমরা যে কিছু জানি না মা। আমরা যে কাঙ্গাল-ভিখারী,—আর মা তুমি রাজরাজেশ্বরী, বিশ্বজননী, ভগবতী দুর্গা। আমাদের তো পদে পদে অপরাধ হবে, তুমি আমাদের অপরাধ নিও না কিন্তু।'

তাঁর কথায় সে কি দৈন্য, কি আকুতি যে ঝরতে লাগল, তা বোঝাবার ভাষা নেই। ভাষায় তা বলাই যায় না। সে সময়ে তোমরা যদি সেখানে থাকতে, তোমরা যদি দেখতে, নিঃসন্দেহে বলতে পারি তোমাদের দু চোখও হয়ে উঠত অশ্রুসজল, যেমন সেখানে উপস্থিত সকলের হয়েছিল।

তাঁরা অনেক অনুনয়-বিনয় করে একটা দিন মাকে সেখানে রেখেছিলেন। তাতে-ই তাঁরা খুশী।

একদিন অস্কোটে বিশ্রামের পর মায়ের আবার যাত্রা হ'ল শুরু। তেমনি আবার কত জনপদ কত গ্রাম পেরিয়ে গেল। যত তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন, পথ চলা ততই কষ্টকর ও শ্লথগতি হয়ে আসছে। দু পা এগুলেই হাঁপ ধরে যায়। পায়ে যেন পাথর বেঁধে দেওয়া হয়েছে, টেনে তোলা যায় না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কষ্টকর।

এবার মা এসে পৌঁছালেন গার্বিয়াং-এ। গার্বিয়াং হলো তৎকালীন ইংরেজ-শাসিত ভারতের অন্তিম উত্তর সীমার একটি জায়গা।

এখন হ'তে আরম্ভ হলো আরো দুর্গম, আরো কঠিন বন্ধুর পথ। এখান থেকে একজন পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন। কারণ এর পরে পথের আর কোনো চিহ্ন ই নেই। চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে আছে আকাশচুম্বী পাহাড়ের উদ্ধত শিখর-গুলো, আর তারি মধ্যে কোথাও অতল-নিম্নে বইছে পার্বত্য নদীর বা ঝরণার ধারা। কেমন করে, কোন্ পথে, কোন্ দিকে এসব পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তা কল্পনায়ও আনা যায় না।

শুধু তাই নয়, আরো শোনা গেল, এদিকে পাহাড়িয়া দস্যুদের উৎপাতও খুব। ওরা নাকি যাত্রী দেখলেই দল বেঁধে আক্রমণ করে। যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। কখনো কখনো প্রাণেও মেরে ফেলে।

এ সংবাদে সকলেরই মনে ভয়ও হতে লাগল। আর হবেই তো, ভয় না হয়ে পারে! এই দুর্গম পাহাড়ে অজানা-অচেনা দেশে যদি দস্যুরা আক্রমণ

করেই বসে, তখন কি উপায় হবে? ওরা যদি প্রাণে নাও মেরে ফেলে, সব ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও তো সবাই না খেয়েই মরে যাবে। তাই না?

তবুও সকলের ভরসা—সঙ্গে মা আছেন। তাই সাহসে ভর করে একজন গাইড সংগ্রহ করে আবার যাত্রা হ'ল শুরু। গাইড চলেছে ঘোড়ার পিঠে, আর মালপত্র কুলীদের ঘাড়ে।

ক্রমে পেরিয়ে গেল তাকলাকোট, পেরিয়ে গেল কালাপাণি। এবার লিপুপাস।

'লিপুপাস' কি জান? 'লিপু' একটা পাসের নাম। পাস মানে সংকীর্ণ গিরিপথ। এ পথের উচ্চতা প্রায় ষোলো-সতেরো হাজার ফিট অর্থাৎ ষোলো সতেরো হাজার ফিট ওপরে একটা সংকীর্ণ পার্বত্য পথে যাত্রীদের এগিয়ে যেতে হবে এই লীপু পর্বতটাকে অতিক্রম করতে। সে যে কি পথ, তা না দেখলে কল্পনায়ও আনা যায় না। সে পথ অতীব কঠিন, ওখানে বাতাস হয়ে আসে অত্যন্ত হালকা, মানুষের শ্বাসযন্ত্রের পক্ষে সে বাতাস টানা খুব কষ্টদায়ক। তাই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আর সেখানে, সেই উচ্চতায় দিনরাতই অবিরল ধারায় চূর্ণ তুষার কণার বৃষ্টি ঝরতে থাকে—ফলে সে পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। তার ওপর প্রচণ্ড শীতে হাত-পা অবশ হয়ে আসে। সে পথে চলতে গিয়ে অনেকে জ্ঞান হারিয়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। তবুও যেতে হয়। কারণ কৈলাসপতির দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকলে, এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

তাই 'জয় মা', 'জয় মা' বলে মায়ের সঙ্গে ওরা গাইডের নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল। অনেক কষ্টে ,অনেক দুঃখে, অনেক সাবধানতার পর ওরা পেরিয়ে গেল 'লিপু' পাশ। পেরিয়ে গেল আরো দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল রংগুং।

এরপর বুঝি আর চিন্তা নেই। অকস্মাৎ ওরা চোখের সামনে দেখতে পেল সম্মুখে প্রসারিত তিব্বতেই সেই সুবিশাল ময়দান যাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'পৃথিবীর ছাদ'। উঃ কি সুন্দর! কি অপূর্ব তার দৃশ্য! কতশত রং বেরঙের ঘাস ফুলে সে ছাদে বিছানো রয়েছে রঙ্গিন গালিচা। সে সৌন্দর্য যেন মন-প্রাণ কেড়ে নেয়। লিপুপাসের ও রংগুং-এর যত কষ্ট সব যেন এক নিমেষেই কর্পূরের মত উবে গেল। চিত্তের প্রসন্নতা.যেন ঝলসে উঠল সকলের চোখেমুখে।

ওটাকে 'পৃথিবীর ছাদ' কেন বলে জান? তার কারণ হ'ল তিব্বতের উচ্চতা

ষোলো হাজার ফুটেরও বেশী। এত উঁচুতে এত বিশাল বিস্তৃত সমতল ভূমি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। তাই এর নাম 'পৃথিবীর ছাদ'। বুঝেছ তো!

কি সুন্দর সে জায়গাটা! আকাশে উঠেছে সূর্য, আলো তার ঝলমল করছে সেই তুষার ভেজা ঘাস-ফুলের ওপর। যে দিকে চোখ ফেরান যায়, সেদিকেই শুধু আলো আর আলো। যেন আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে সে দেশটা।

তা ছাড়া, আরো আশ্চর্য হবার ব্যাপার আছে সেখানে। দিনের বেলা ভরা দুপুরেও ওখানে দাঁড়িয়ে একটা নক্ষত্র দেখা যায়, যেমন নির্মেঘ রাত্রিতে আমরা দেখি আমাদের ছাদে দাঁড়িয়ে। সত্যি, ভেবে দেখ তো, অবাক লাগছে না ভাবতে—দিনের বেলা একই আকাশে সূর্য আর তারা!

যাক, সেই অনিন্দ্যসুন্দর প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে মা এগিয়ে চলেছেন সবাইকে নিয়ে। গাইড বলছে, আর বিলম্ব নেই। ক্ষণিক পরেই দর্শন মিলবে মানস সরোবরের। সেও এক বিরাট ব্যাপার। আচ্ছা, হিমালয়ের সবই কি বড় বড় হয়? ওর পাহাড়গুলো তো পৃথিবীর সর্বোচ্চ। সমতল ভূমিটাও তো শুনলে এমন দিগন্তজোড়া যে সেটা সমস্ত পৃথিবীরই ছাদ হয়ে গেছে। আর এই সরোবর? তোমরা তো কত সরোবর দেখেছ। ভারতে কত সরোবরই আছে। কোনটার পরিধি ছ'শ গজ, কোনটার বা হাজার গজ, আর খুব বড় হলে, ২।১ মাইল হতে পারে। কিন্তু হিমালয়ের এই সরোবর? এর পরিধি কত শুনবে? এর পরিধি চুয়ান্ন মাইল। অর্থাৎ ওর চারপাশে এক চক্কর দিয়ে আসতে হলে তোমাকে চুয়ান্ন মাইল হাঁটতে হবে। আবার কিছু দূরেই রয়েছে আর একটা সরোবর, তার নাম 'রাক্ষস তালাও'। তালাও মানে সরোবর। তার ধারে বসে লঙ্কার রাবণ রাজা শিবের তপস্যা করতেন। তিনি তো রাক্ষস ছিলেন, তাই ওই সরোবরের নাম হয়েছে 'রাক্ষস তালাও'। তার পরিধি আরও বড়। তার পরিধি প্রায় ৬০ মাইল।

সত্যি হিমালয়ের নাম হিমালয় না রেখে, ভীমালয় রাখলেই ভালো হত। কি বল?

যাক, দুর্গম পথের অবসান ঘটেছে, উৎরিয়ে গেছে দুর্লঙ্ঘ্য গিরি—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সবাই এগিয়ে চলেছে। সকলের চোখেমুখেই প্রসন্নতার হাসি। কিন্তু—

হ্যাঁ এর মধ্যেও এক 'কিন্তু' এসে হাজির হ'ন। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল সকলের প্রসন্নতা। চোখে-মুখে ফুটে উঠল এক অজানা আতঙ্ক ও ভীতির ছাপ। কি ব্যাপার ?

কিছুক্ষণ আগে একসময়ে ঘোড়সওয়ার গাইড যাত্রীদের পেছোনে রেখে এগিয়ে চলে গিয়েছিল দ্রুতবেগে। এবং এই মাত্র সে ফিরে এল দ্রুততর গতিতে। এসেই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সংবাদ দিল যে, একদল দস্যু এই যাত্রীদলের সংবাদ পেয়েছে এবং তারা সদলবলে এগিয়ে আসছে। অতএব সাবধান।

তোমরা বুঝতেই পারছ সংবাদটা নিশ্চয়ই সু-সংবাদ নয়। তাই ভয়ে ভীতিতে সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ছোটবেলায় দিদিমা ঠাকুরমার কাছে সন্ধ্যের পর ভূত-পেত্নীর গল্প শুনতে শুনতে কেমন ধীরে ধীরে তাঁদের গা ঘেঁষে বসে সাহস সঞ্চয় করতে চাইতে, ঠিক তেমনি যাত্রীরাও ঐ সংবাদ পেয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে মায়ের কাছ ঘেঁষে একে একে বসে পড়ল। বসে তাকিয়ে রইল মায়ের মুখের দিকে। সকলের চোখে-মুখে একটি প্রশ্ন—এখন উপায় ?

অথচ মাকেও সে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মা একেবারেই নির্বিকার। তেমনি হাসিমুখেই কথা বলে চলেছেন সকলের সঙ্গে যেন কিছুই হয় নি কিংবা সংবাদটা বোধ হয় সুসংবাদও হতে পারে।

এদিকে পথপ্রদর্শক সংবাদটি দিয়েই চক্ষের নিমেষে আবার কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। বন্দুকধারী কুলিগুলোও উধাও। বিপদ যখন আসে, তখন বোধ হয় এমনি করে সব দিক থেকে-ই আসে।

হঠাৎ পি, পি, করে কয়েকটা সিটি একসঙ্গে বেজে উঠল। সেই জোরালো বাঁশীর শব্দে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। মায়ের সঙ্গীরা আরো ভীতত্রস্ত হয়ে মাকে ঘিরে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। তারা একমনে মায়ের নাম জপ করতে আরম্ভ করল। কৈলাসপতি শিব-শংকরের একি পরীক্ষা! তাদের দৃষ্টি পড়ে রইল তাঁবুর ফাঁক পথে দস্যুদের পথের দিকে।

এদিকে দস্যুর দল ক্রমশঃই নিকটবর্তী হতে লাগল। তাদের অশ্বখুরের শব্দ ক্রমশঃই স্পষ্টতর হয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল সেই অশ্বারোহী পথপ্রদর্শক দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ঠিক মায়ের তাঁবুর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়ে

রইল। তবে কি ঐ লোকটি দস্যুদলেরই লোক। তাদেরই সাহায্য করতে ঠিক সময়ে ফিরে এসেছে। না কি সে প্রভুভক্ত? যাদের পথ প্রদর্শনের ভার সে গ্রহণ করেছে তাদের রক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেও সে দস্যুদের মোকাবিলা করবার জন্যেই দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে? কোন্‌টা ঠিক?

ইতিমধ্যে দস্যুদের দল তাঁবুর নিকট উপস্থিত হতেই তাদের মধ্যে দুজন দস্যু তাঁবুর দরজায় পথপ্রদর্শকের কাছে এসে হাজির। তারা এগিয়ে আসতেই পথপ্রদর্শক ইঙ্গিত করে তাদের যেন কি বলল। তারা সে ইঙ্গিত পেয়েই তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করে একেবারে যাত্রীদের মতই ঘনিষ্ঠ হয়ে মায়ের কাছে বসে পড়ল। মা তো অর্ধশায়িতা। কোলের কাছে তাঁর বাম হস্ত উপুড় করা অবস্থায় রাখা। তারা মায়ের দিকে তাকাল। তারা কি ভাবল তারাই জানে। তাদের মধ্যে একজন মায়ের হাতের আঙুলগুলো একে একে স্পর্শ করতে লাগল. মনে হ'ল যেন আঙ্গুলগুলো গণনা করছে। এইভাবে কিছুক্ষণ বসে তারা বাইরে এসে পথপ্রদর্শককে আবার যেন কি বলল। বলে সদলবলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে। কিন্তু সুখের বিষয়, আর তারা ফিরে আসেনি।

শুনলে তো ঘটনাটা। এবার তোমরা বলোতো, ব্যাপারটা কি হ'ল? দস্যুদের সর্দার দুজন হঠাৎ কেন মার কাছে এসে বসে পড়ল, আর কেনই বা আঙ্গুলগুলো গণনার ভঙ্গিমায় স্পর্শ করছিল, তা কি কিছু বুঝতে পারছ? আমরা তো আজও তা বুঝতে পারিনি। মাকে জিজ্ঞাসা করতে মা শুধু হেসেছিলেন। লীলাময়ী মায়ের এ আর এক অদ্ভুত লীলা!

যাক্, যথাসময়ে তাঁবু গুটিয়ে আবার সবাই মাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। কারো কারো মনে তখনও ভীতির শঙ্কা লেগে আছে। কিন্তু অল্প দূর এগিয়ে যাবার পরেই ওরা যা দেখল তা কি সারা জীবনেও তারা ভুলতে পারবে? ভাবছ, বুঝি আবার দস্যু? না দস্যু নয়, এবার দৃশ্য! সে যে কি অপূর্ব সুন্দর, কি বিস্ময়কর তা অবর্ণনীয়। সবাই পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই একসঙ্গে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখল, তাদের সম্মুখে অনতিদূরে বিস্তৃত রয়েছে ঠিক ওপরের আকাশের মতই আর একখানি আকাশ। কি ওটা? ওই তো মানস-সরোবর। যতদূর দৃষ্টি যায় আকাশের রংএ রঞ্জিত হয়ে পড়ে আছে এক বিশাল জলরাশি, সুন্দর ধূসর, ধূসর সুন্দর।—অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য, অবাস্তব!

ও, ইতিমধ্যে আর একটি ব্যাপারও ঘটেছে, তা বলতে ভুলে গেছি।

ব্যাপারটা হ'ল এই যে, মা যখন তাকলাকোটে, তখন একটি কৃষ্ণবর্ণ কুকুর হঠাৎ কোথা থেকে এসে উপস্থিত। শুধু উপস্থিতই নয়, একেবারে মায়ের অতি কাছে এসে বসে পড়ে। মার সঙ্গে এত লোকজন, কুলি ইত্যাদি, কিন্তু কুকুরটার সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। মাও কি ভেবে ওর পিঠে হাত দিয়ে একটু স্পর্শ করলেন। কি যে তার হ'ল কে জানে, সেদিন থেকে সে মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই চলে, মা দাঁড়ালে সেও দাঁড়ায়। আর মাঝে মাঝে মায়ের দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।

পঞ্চ পাণ্ডবের স্বর্গারোহণের কথা নিশ্চয়ই মহাভারতে পড়েছ!—একি তারই পুনরাবৃত্তি? কে জানে?

তবে মার জীবনে কুকুর বেড়াল নিয়ে এ জাতীয় লীলা অনেক দেখা গেছে?

একবার কাশীতে মায়ের উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ হচ্ছে। সাধু-মহাত্মা-ভক্ত অনেকেই উপস্থিত। অকস্মাৎ একটি কুকুর সকলের অলক্ষ্যে একেবারে মায়ের আসনের পাশে এসে উপস্থিত।

সর্বনাশ, সৎসঙ্গ ভবনে কুকুর! উপস্থিত জনতার মধ্যে জেগে উঠল চাঞ্চল্যের এক আলোড়ন। সঙ্গে সঙ্গেই একটি যুবক দৌড়ে গেল কুকুরটিকে বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোনো উপায়েই তাকে বহিষ্কৃত করা গেল না। বিতাড়িত হয়েও ইতস্ততঃ ঘুরে ফিরে সে কেবল মায়ের আসনের নিকটই এসে উপস্থিত হয়। অনেক চেষ্টার পরও যুবকটি যখন কুকুরটিকে বিতাড়িত করতে অপারগ হ'ল, তখন মা যুবকটিকে ইশারায় ডেকে, তার হাতে একটি ফুলের মালা দিয়ে বললেন, 'ওর গলায় পরিয়ে দাও'। আশ্চর্য ব্যাপার। কুকুরটিকে মালাটা পরিয়ে দিতেই সে অত্যন্ত শান্তভাবে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে সৎসঙ্গ ভবন ত্যাগ করে চলে গেল। ঠিক মনে হতে লাগল যেন ঐ মালাটি নেবার জন্যই সে এসেছিল।

মার শৈশবেও একবার একটি বেড়াল ঘরে পুনঃ পুনঃ ঢুকে দুধ ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছিল। মায়ের মা, দিদিমা অনেক কষ্ট করেও বেড়ালটিকে বিতাড়িত করতে পারছিলেন না।

একদিন দাদামশায়ের আহারের সময় হয়ে এসেছে। দিদিমাকে জল-পিঁড়ি ইত্যাদি আনতে যেতে হবে। বেড়ালটিও এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে।

দিদিমা উপায়ান্তর না দেখে মাকে ডেকে বললেন,—'নির্মলা, এখানে এসে বোস তো। আমি খাবার জল নিয়ে আসি, বেড়াল যেন ভাতে মুখ না দেয় দেখিস!'

নির্মলা এসে ঘরে বসল, দিদিমা তো চলে গেলেন জল আনতে, আর সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ালটিও এসে উপস্থিত। বেড়ালটিকে দেখে ছোট্ট নির্মলা উঠে গিয়ে বেড়ালটির কাছে হাজির। মা কাছে যেতেও বেড়ালটি কিন্তু একটু ভীতও হ'ল না, পালিয়েও গেল না। স্থিরভাবে বসে 'মিউ' 'মিউ' করে ডাকতে লাগল। আর নির্মলা? নির্মলা শিশুসুলভ চপলতায় তার গায়ে হাত দিল। অদ্ভুত ব্যাপার, মা তার গায়ে হাত দিতেই সেই যে ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিল, আর কোনদিন তাকে সেই বাড়ীর ত্রিসীমীনাতেও দেখা যায়নি।

আর একবার মা চলেছেন ঝুঁসীর পথে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বেশ কিছু ভক্তও। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ছাগ-শিশু এসে মায়ের পা ঘেঁষে ঘেঁষে চলতে লাগল। ভক্তদের দৃষ্টি সে দিকে পড়তেই তারা ছাগ-শিশুটিকে সরিয়ে দিতে গেলে মা বলে উঠলেন,—'থাক্ না। ঐ ত রাস্তার ঐ মোড় পর্যন্তই তো যাবে।' সত্যি সত্যিই অল্প দূরেই রাস্তাটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটা পথ ঘুরে গেছে বাঁদিকে। সে পর্যন্ত গিয়েই ছাগশিশুটি বাঁদিকের পথ ধরে এগিয়ে চলে গেল। মা চলে গেলেন সোজা পথ ধরে।

আর একবার মা উপস্থিত রয়েছেন মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে। প্রতিদিন বিকেল হলে-ই মাকে দর্শন করতে বহু স্থানীয় ভক্ত মাতৃ-মন্দিরের সামনে একত্রিত হ'ত। মা যথাসময়ে এসে দাঁড়াতেন মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। প্রতিদিন ঠিক ঐ সময় মাতৃমন্দিরের ছাদের কার্নিসের ওপরে এসে উপস্থিত হ'ত একটি টিয়াপাখী। আর এমন একটি স্থানে সে বসত যে, সে মলমূত্র ত্যাগ করলে দর্শনরত ভক্তদের ওপরেই তা পড়ার কথা।

একদিন এক দর্শনার্থী সেটিকে লক্ষ্য করে ঢিল মারতে উদ্যত হলে মা বললেন, —'ওকে কেন মারছ? রোজ কি আর ও আসবে। কাল এলে তাড়িয়ে দিও।'

মার কথা শুনে আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না যে সে আর কাল থেকে আসবে না।

পরের দিন থেকে আর সে কোন দিনই আসেনি। বোধহয় সে মার কথা বুঝতে পেরেছিল, তাই অভিমানভরেই বিদায় নিয়ে গেছে।

যাক, মার জীবনে পশুপাখীদের সঙ্গে এ জাতীয় আরো যে কত লীলা দেখা গেছে, তা বলে শেষ করা যায় না। সে সব দেখে কখনো মনে হয়েছে—মা বুঝি তাদের মনের কথা সব বুঝতে পারেন। আবার কখনো মনে হয়েছে মায়ের কথাও বুঝি তারা বোঝে। আবার কখনো দেখেছি, আমরা যেমন মাকে ভালবাসি, তারাও ঠিক ততখানিই মাকে ভালবাসে ; মায়ের আশ্রয় পেলে তারাও ঠিক আমাদের মতই নিশ্চিন্ত হয়।

যাক বলছিলাম কৈলাস যাত্রার কথা। অদূরেই মানস-সরোবর।

মানস-সরোবর দৃষ্টিগোচর হতেই মা ভোলানাথ ও ভাইজীকে আগে পাঠিয়ে দিলেন সরোবরের দিকে। আর বললেন,—'তোমরা যাও। আমরা সবাই ধীরে ধীরে আসছি।'

মার আদেশ পেয়ে ভাইজী ও ভোলানাথ দ্রুতপদে সরোবরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা দেখলেন, কী সুন্দর, একেবারে তুষার-শুভ্র শত শত রাজহংস সে সরোবরে কেমন ভেসে বেড়াচ্ছে। তার ছোট ছোট ঢেউগুলি বাতাস লেগে আছড়ে পড়ছে সরোবরের কূলে। আর তার জল? নিষ্কলঙ্ক কাকচক্ষু নির্মল সরোবরের তলদেশে পড়ে থাকা পাথরগুলো চকচক করছে।

এসব দেখে ভাইজী এক কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর কি ভাবান্তর হ'ল কে জানে, তিনি একটুও কালবিলম্ব না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সরোবরের জলে, স্নান সেরে উঠে এসেই, তাঁর পরিহিত বস্ত্রাদি একে একে সব খুলে ফেলে, একেবারে উলঙ্গ শরীরে ভোলানাথের পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—'পিতাজী' আমাকে বিদায় দিন, আমি এক্ষুণি ঐ দিকে চলে যাই। আমাকে আদেশ দিন, করুণা করুন। আমি যে আর……'

ভোলানাথের আর তাঁর কথা শোনা হল না। তিনি ভাইজীকে লক্ষ্য করে দেখেন, তাঁর চোখে-মুখে তীব্র বৈরাগ্যের ঔদাসীন্য, তাঁর কথাবার্তায় অবধূত ভাব যেন উপচে পড়ছে। তিনি একটু ভীত হয়েই বললেন,—'না, না, একি?

একি করছ ? তোমার মা তো এখনো এসে পৌছান নাই। শীঘ্র কাপড় পর।'

ভাইজী তাঁর কথা মেনে নিলেন। কাপড় পরতে না পরতেই মা সেখানে এসে উপস্থিত। মাকে দেখেই তিনি আবার বলে উঠলেন, 'মা আমাকে আদেশ করুন, আমি কোথাও চলে যাই। আমাকে বিদায় দিন।'

তাঁর কথা শুনে মার আর কিছুই বুঝতে বাকী রইল না। তিনি দেখলেন, এ তো তীব্র অবধূত ভাব। আর সঙ্গে সঙ্গেই মার মুখ দিয়েও অনর্গল ভাবে সন্ন্যাসের মন্ত্রাদি স্বতঃ-উচ্চারিত হতে লাগল।

আর ভাইজী ? ভাইজীর কানে সে মন্ত্র প্রবেশ করতেই তিনি অধীর আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন, -'পেয়েছি পেয়েছি, কী আনন্দ, আমি হারিয়ে যাচ্ছি।'

বলেই আবার মাকে বলছেন—'মা, মা, আমি এবার মৌন হয়ে যাই ?'

মা দেখলেন এই দুর্গম পথঘাট, এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে, এ সময় মৌন হয়ে গেলে সমূহ বিপদ হতে পারে। হয়ত এই ভেবেই মা বললেন,—'না, এখন মৌন হওয়া ঠিক হবে না। তবে তোমার যখন এরূপ ইচ্ছা জেগেছে, তাই এখন থেকে তোমার নাম হ'ল মৌনানন্দ। তোমার উপাধি হল পর্বত। আজ তোমার বিদ্বৎ সন্ন্যাস হয়ে গেল।'

ভেবে দেখ তো ঘটনাটা কত অদ্ভুত। মা সাক্ষাৎ ভগবতী। তাঁর মুখে স্বতঃ উচ্চারিত সন্ন্যাস মন্ত্র—এ পেতে হলে কত লক্ষশত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল থাকা চাই। তাঁর তা ছিল বলেই, মন্ত্র শুনেই তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন 'পেয়েছি পেয়েছি।' তিনি কি পেয়েছিলেন ?

তিনি কি পেয়েছিলেন জানো ? তিনি পেয়েছিলেন—যিনি চিরপ্রকাশ, চির সত্য, যিনি চির আনন্দময় তাঁর দর্শন। তিনি পেয়েছিলেন, যা পেলে মানুষের সব পাওয়া হয়ে যায়। যাঁকে পেলে মানুষ চিরদিনের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পরপারে চলে যায়।

কৈলাস থেকে ফেরার পরে তিনি আর বেশীদিন বাঁচেন নি। ফেরার পথে আলমোড়াতেই তিনি তাঁর দেহরক্ষা করেছিলেন। যাবার পূর্বে তিনি মাকে বলে গিয়েছিলেন,—'মা, আমি দেখছি তুমি আর আমি এক। আমি অনুভব করছি চিরপ্রয়াণের অশেষ আনন্দ।'

যাক্, মাকে নিয়ে মানস সরোবরে দর্শন স্নানাদি সেরে সবাই আবার এগিয়ে

চলল। গাইড ও কুলি সঙ্গেই আছে। গাইড বলে দিল কৈলাস আর মাত্র দু দিনের পথ।

এ সংবাদে সকলের সে কি আনন্দ! আর মাত্র দু দিনের পথ! আর আনন্দ হবেই বা না কেন! আর মাত্র দু দিন! তার পরেই তো মিলবে সেই দুর্লভের দর্শন। পরিসমাপ্তি ঘটবে দুঃখ যন্ত্রণাময় যাত্রার। যাত্রীরা এগিয়ে চলল পুনরুজ্জীবিত উৎসাহে।

যথাসময়ে দেখা দিল গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড একটি বরফের পুকুর। পুকুরের ওপরটা শীতের প্রকোপে জমে বরফ হয়ে আছে। লাঠির আঘাতে তা ফাটিয়ে তারি মধ্যে ডুব দিয়ে উঠতে হয়।

এর পাশেই কৈলাস। কৈলাস ২২০২৮ ফিট উঁচু—শিবলিঙ্গের আকারে চির তুষারাবৃত শিবপুরী। সেই কৈলাস দৃষ্টিগোচর হতেই সবাই একসঙ্গেই কৈলাস-পতির জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। আজ তাদের জীবন সার্থক, যাত্রা সফল। বিগলিত ভক্তি-শ্রদ্ধায়, অন্তরের কৃতজ্ঞতায় সবাই কৈলাসপতিকে প্রণাম ক'রে মাকে প্রণাম করতেই, তাঁদের উভয়ের আশীর্বাদ বুঝি মায়ের দৃষ্টি ধারায় ঝরে পড়ল। সত্যই বলতে হয় এই জন্মেই ঘটল তাদের জন্ম-জন্মান্তর।

যাক্, কৈলাস দর্শন করে মা ভক্তদের নিয়ে আবার ফিরে এলেন আলমোড়া হয়ে সেই দেরাদুনে। দীর্ঘদিন পরে মা ফিরেছেন—এ সংবাদ নিয়ে দলে দলে লোক ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মায়ের কাছে আসতে লাগল। তার মধ্যে বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, দেশী-বিদেশী সব জাতীয় লোকই আছে। তারা আসে, মাকে দর্শন করে, তারপর চলে যায়। কয়েকটা দিন এভাবে থাকার পর মার আবার শুরু হল পর্যটন।

মার সব ব্যাপারে ই কেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এ ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। মা ঘুরেই চলেছেন তো ঘুরেই চলেছেন। ভারতের আনাচে-কানাচে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র মা ঘুরে চলেছেন ঘূর্ণিবাত্যার মত। কি রকম জান? যেমন মা কোথাও গেছেন, দুই বা তিন রাত্রি বাস করেই বলে বসেন অমুক জায়গায় চল। আর 'চল' বলতে 'চল', হয়ত রাত বারটা কি দুটো, কি দুপুর একটা, যে সময়-ই হোক না কেন—বলে বসবেন এক্ষুণি চল। কটায় গাড়ী দেখ। ভেবে দেখ এ কত কঠিন ব্যাপার! দিন নেই, রাত নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, বলার সঙ্গে সঙ্গেই মা বেরিয়ে পড়তেন। সঙ্গী-সাথীদের-ও মার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হ'ত।

এর মধ্যে কিন্তু মার একটা দিক ফুটে উঠত। সেটা হ'ল তাঁর অনাসক্তি ও নিস্পৃহা। 'ধর, হয়ত কোন রাজা বা ধনীর বাড়ীতে গেলেন। মা এসেছেন, তাঁদের কত আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে হোক, যাতে মা কয়েকটা দিন সেখানে থাকতে পারেন বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে তার ব্যবস্থা তাঁরা করলেন—অথচ মার কিন্তু সে দিকে কোনো লক্ষ্য-ই নেই। গড়ে ওঠা সেই আনন্দের হাটকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে মা পরের দিন-ই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে।

এই যেমন ধর, একবার মা গিয়েছেন কানপুরে—এক শেঠের বাড়ীতে। তারই প্রার্থনায় মা গিয়েছেন। আশ-পাশের গ্রামের বহু লোক এসেছে মার দর্শনে। কত ভক্তিভরে তারা মায়ের জন্যে এনেছে কত কিছু,—স্বর্ণালঙ্কার, পরিধেয় বস্ত্র, রূপোর থালাবাটি গেলাস, সহস্র সহস্র টাকার থলি এমনি আরো কত কী! সবাই মাকে সব দিয়ে প্রণাম করে প্রার্থনা করছে, তুমি এইটা একটু ব্যবহার কোরো, কিংবা এইটা একটু ব্যবহার কোরো। আর সে সব পেয়ে মা কি করলেন জানো? মা স্তূপীকৃত সেই অর্থ-বস্ত্র-অলঙ্কারদি দু হাতে উপস্থিত জনতার মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন। দিন দুই এই ভাবে যাবতীয় দ্রব্যাদি নিঃশেষে বিতরণ করে তৃতীয় দিনেই মা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

আর একবার আহমেদাবাদে মা গেছেন। মাকে নিয়ে তাদের সেকি উল্লাস! দেখতে দেখতে এক দুই দিনের মধ্যেই সে স্থান উৎসবের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেলো। কত রকম উৎসব শুরু হয়ে গেল এক-ই সঙ্গে। কোথাও সৎসঙ্গ সভায় বিশিষ্ট মহাত্মাগণ বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন, কোথাও বসেছে রামায়ণ গানের আসর অথবা কোথাও বা নামযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, আবার তারি সঙ্গে কোথাও চলছে পালা কীর্তনের ধুম। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার পরিপাটির ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ। যে দিকেই দৃষ্টি ফেরাও না কেন, সর্বত্র অগণিত জনতার ভীড় আর তাদের কোলাহল ও কলরবে চতুর্দিক দিবারাত্র মুখরিত।

আকস্মৎ শোনা গেল মা আজই বৈকাল বেলা চলে যাবেন।

সে সংবাদ প্রচারিত হতে-ই সেই উল্লাসের আনন্দলোকে নেমে এল বিষাদের ছায়া। কর্মকর্তাগণ মায়ের কাছে নিবেদন করলেন,—'মা আর দুটো দিন-ও কি থাকা সম্ভব হয় না? দীর্ঘ দিনের পর তো তোমার এবার আসা।'

মা তার কি উত্তর দিলেন জানো? মা বললেন,—'পিতাজী, মাতাজী ও বন্ধুরা, এ শরীরটা তো এভাবে-ই ঘুরে বেড়ায়। আবার কবে এসে উপস্থিত হয় কে জানে! এবার আসি, কেমন?'

মায়ের সেই স্নেহঝরা কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গিমায় কারো মুখে আর কোনো কথাই যোগালো না। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা মস্তকের ইশারায় ইঙ্গিত করে বললেন,—'আচ্ছা! অথচ পরক্ষণেই তারাই বলে উঠল,—'এ কি করলাম!'

এ-ও মায়ের এক বিচিত্র ব্যাপার। কতবার লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে তুমি যদি মাকে কিছু বলতে চাও, নিশ্চয় জেন, যদি সে কথা মায়ের খেয়াল বিরোধী হয়, তুমি সে কথা কিছুতেই মাকে বলতে পারবে না। আর না হয় সে কথা মার কাছে বলতে গিয়েও তুমি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবে। অথচ মার নিকট হ'তে ফিরে আসার পর মুহূর্তেই তুমি বলবে,—'আরে, মার কাছে যা বলতে গেলাম, তা তো বলাই হল না।' এভাবে দু-তিনবার চেষ্টা করলেও তোমার কিছুতেই তা বলা হয়ে উঠবে না। এ অভিজ্ঞতা, যাঁরা মার কাছে এসেছেন তাঁদের সকলেরই আছে।

আর এই যে বললাম 'মা দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন'—এটাও কিন্তু তোমার আর আমার ভাষায়। এ বিষয়ে মা কি বলেন জানো? মা বলেন,—'দেশ বিদেশ আবার কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটাই তো দেশ। একটাই ফুলের বাগান। তোরা সব সেই বাগানে ফুলের মত ফুটে আছিস্। আমি আমার বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি মাত্র। দেশ-দেশান্তর, স্বদেশ-বিদেশ আবার কোথায়?'

শোন কথা, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটাই বাগান!

কিন্তু—এ-ও কিন্তু হাসিতামাসার কথা নয়। যখন তোমরা বড় হবে, নানান জ্ঞানের বই পড়বে, তখন দেখবে মায়ের এই উক্তি, অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অক্ষরে অক্ষরে খাঁটি। আমাদের শাস্ত্রে, বেদে-উপনিষদে তো এ কথাই বলেছেন মুনি-ঋষিরা! তাঁরা বলেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্বরূপে একমাত্র ঈশ্বরই প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছেন বাগানের বিকশিত ফুলের মত। তাঁরা বলেন, তিনি ছাড়া কোথাও, কোনো রূপেই আর কিছুই নেই। আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে সর্বত্র তিনিই ফুটে আছেন ফুলের মত। আর তাঁরই আনন্দ চতুর্দিকে ছড়িয়ে

পড়ছে, ঠিক যেমন প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ বাতাসের সঙ্গে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। তবে আমরা তা দেখি না কেন? বুঝি না কেন? তার কারণ আমাদের সে দৃষ্টি নেই। মুনি-ঋষি মহাপুরুষদের সে দৃষ্টি আছে, তাই তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন।

এ ব্যাপারে-ও অনেক কথা আছে। শোনো, তা থেকে দরকারী কথা তোমাদের শোনাই।

একবার, তোমাদেরই মত অল্পবয়স্ক একটি ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল —'মা তুমি তো বল সবই ভগবান। তুমি যে ভগবান তা তো সবাই জানে, আমিও জানি। কিন্তু আমিও কি ভগবান, তা তো জানি না।'

মা ছেলেটির প্রশ্ন শুনেই খুব হেসে উঠলেন। পরে ছেলেটিকে বললেন,— 'আমি ভগবান তা কি তুমি সত্যিই জানো। যদি সত্যি সত্যিই তা জেনে থাক, তবে তুমি-ও যে ভগবান, তাও তুমি জানো।'

একটু পরে মা আবার ছেলেটিকে বললেন,—'কি বন্ধু, বলো, তুমি যে ভগবান তা তুমিও জানো কি না—?'

মায়ের বলার ঢং ও স্বরে ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল,—'হ্যাঁ'।

সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাঁরা বসেছিলেন, সবাই হেসে উঠলেন খুব জোরে।

আর একবার একটি ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—'মা, তুমি তো বলো সবই ভগবান। তবে তো আমিও ভগবান। তবে আমার লোভ হয় কেন? তুমি তো বল ভগবানের লোভ-ক্রোধ কিছুই থাকে না।'

প্রশ্ন শুনে মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার কিসের লোভ হয়?'

ছেলেটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল,—'মিষ্টি খাবার লোভ।'

ছেলেটির কথা শুনে সবাই হেসে উঠতেই মা বললেন,—'তোমরা হাসছ কেন? ও তো সত্য কথাই বলেছে।' বলেই আবার ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করছেন,—'তারপর'?

ছেলেটি সকলের হাসিতে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়েছে। চোখে-মুখে তার সলজ্জ ভাব। তাই মার প্রশ্ন শুনে সে তাড়াতাড়ি বলল—'আর কিছু না'।

মা তার সলজ্জ ভারটা কাটিয়ে দেবার জন্য বললেন,—'যাক সে কথা। হ্যাঁ শোনো, তুমি যেন কি জিজ্ঞাসা করছিলে? তোমার লোভ হয় কেন?'

মায়ের কথা শুনে ছেলেটির সংকোচ ভাব কিছুটা কেটেছে। সে সম্পূর্ণ করে আবার প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করল,—'না, আমি বলছিলাম যে ভগবানের তো লোভ

হয় না। তুমি ভগবান তাই তোমার লোভ হয় না। আমার তো লোভ হয়। তবে কি আমি অল্প ভগবান আর তুমি বেশী ভগবান?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের আবার সে কি হাসি। সকলের হাসি দেখে এবার ছেলেটি দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলতেই মা তাকে বললেন,—'না, সব এক ভগবান।'

আর একবার, মনে পড়ছে, মা সৎসঙ্গে বসে আছেন। একটি যুবক মাকে প্রশ্ন করলো—'মা ভগবান কি আছেন? তুমি তাঁকে দেখেছ, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছ?'

মা উত্তর দিলেন,—'কখনো কেন? এখনো দেখছি।'

যুবকটি বোধ হয় এ উত্তর আশা করে নি। তাই সে একটু চকিতভাবেই আবার প্রশ্ন করল,—'কৈ, কোথায় ভগবান?'

মা হাত ঘুরিয়ে বললেন,—'এই তো।'

মা 'এই তো' বলতেই যুবকটি একবার তার চতুর্দিকে দেখে নিল। তারপর বলল—'এ ত প্রত্যক্ষ নয়, এ ত বিশ্বাসের কথা।'

মা সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—'তোমরাই তো বল, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ। তবে? বিশ্বাস করলেই দেখতে পাবে।'

যুবক—'ভগবানকে না দেখলে, কেমন করে বিশ্বাস করব?'

মা—'আচ্ছা, বিশ্বাস কি করে হবে? তুমি কি আমেরিকা দেখেছো?'

যুবক—'না'।

মা—'তবে আমেরিকা আছে একথা কি তুমি বিশ্বাস করো।'

যুবক—'নিশ্চয়ই করি।'

মা—'কেন বিশ্বাস করো?'

যুবক—'কারণ যারা সে দেশে গেছে, নিজের চোখে দেখে এসেছে, তাদের কাছেই শুনেছি।'

মা—'তবে, যারা দেখেছে তাদের কাছে শুনেই তো তোমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, আমেরিকা আছে, তাই তো?'

যুবক—'হ্যাঁ।'

মা—'তবে, ঠিক তেমনি যারা ভগবানকে দেখেছে, তাদের কথায় বিশ্বাস করে, তাদের কথা মত চল। তবেই বিশ্বাস হবে যে ভগবান আছেন। ভগবানকে দেখতে পাবে। বুঝেছ।'

যুবকটি মাথা নেড়ে জানাল যে, সে বুঝেছে।

তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মা এমনিভাবে যে কত বিষয়ে কত কথা বলেছেন, তা সব শুনলে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে। যখন বড় হয়ে বড় বড় বই পড়বে,—তখন দেখবে, পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোন বিষয় নেই, যে বিষয়ে মা কিছু বলেন নি, বা মাকে প্রশ্ন করা হয় নি। অবশ্যি আমাদের ধর্মগ্রন্থেও এসব কথা আছে ঠিকই, কিন্তু মায়ের মতন এমন সহজ, সরল, সুন্দর করে তা আর কোথাও বলা নেই—কোনো যুগেই কেউ সেভাবে বলতে পারে নি।

এখন মায়ের বলা এই যে কথা-বার্তা, এই যে উপদেশ এর মধ্যে কি আছে? লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে এর মধ্যে আছে জনকল্যাণের ভাবনা। মা ঘুরছেন, আর সর্বত্র মায়ের এসব বাণী ছড়িয়ে পড়েছে। আবার মা ঘুরছেন, তার ফলে জেগে উঠেছে কত লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থান, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে কত দেবালয়, কত মন্দির। মায়ের সঙ্গ লাভ করে আর ঐসব উপদেশ-বাণী শুনে কত লোকের জীবন শুধরে গেছে। জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। সেসব কাহিনীর যতটুকু আমাদের জানা আছে, শুধু তা দিয়েই এক মহাভারত রচিত হতে পারে। বড় হয়ে যখন তোমরা সব জানতে পারবে, তখন বুঝতে পারবে, তিনি কেন জগৎজননী, কেন পতিতপাবনী—কেন তাঁকে কল্যাণময়ী মা বলা হয়।

আবার দেখ এই ঘোরাঘোরির মধ্যেও কিন্তু মায়ের সবদিকে সমান দৃষ্টি থাকত। ঘোরাঘোরির সময় মায়ের সঙ্গে যারা থাকত, মা তাদের বলতেন,—'দেখ, একের মধ্যে কত বৈচিত্র্য! ভগবান অনন্ত, তাই তাঁর লীলাও অনন্ত। তোমরা লক্ষ্য করে দেখ বিভিন্ন দেশের ধর্ম-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, কলা-কৃতী, পোষাক-পরিচ্ছদ এমনকি আহার-বিহারেও কত বৈচিত্র্য! অথচ এই সব সেই একেরই তো বিলাস—মূলে এক তিনিই কিনা। এর মধ্যেও দেখ কত শেখবার কত জানবার রয়েছে।'

মা আবার বলতেন, —'ধর, কারো গৃহে কোনো আগন্তুক গেলে তার প্রতি যে অভ্যর্থনা কিংবা আদর-সংকারের ঢং তাও প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিভিন্ন। আবার প্রতি দেশের শিল্পকলাগুলির মধ্যেও—যেমন আলপনা দেওয়া, গৃহসজ্জা, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে—সেগুলোও কি লক্ষণীয় আর শিক্ষণীয় নয়? এবং যেখানে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ তাই গ্রহণীয়।'

অবশ্য এ সব ব্যাপারগুলো তোমাদের নিকট এখন খুব সহজবোধ্য হবে না, কারণ এ বুঝতে হলে চাই একটু মানসিক প্রস্তুতি।

আবার এই ঘোরাফেরার সময়ে এমন সব ঘটনাও ঘটত যা মানুষের বুদ্ধির বাইরে।

একবার মা গেছেন তারাপীঠে অনেককে নিয়ে বেড়াতে। সেখানে গিয়ে মা দেখেন রাস্তা দিয়ে অনেক লোক গান গাইতে গাইতে চলেছে। রাস্তার এক পাশে নদী, আর এক পাশে গাছপালা। মাও চলেছেন তাদের সঙ্গে। মাকে দেখে ওদের কি মনে হ'ল কে জানে! ওরা মার কাছে এসে খুব আপন ভাবে বলতে লাগল, 'চল আমরা লুকোচুরি খেলি'। বলেই আবার বলছে, 'তুমি লুকোবে, আর আমরা তোমাকে খুঁজে বার করব।'

লুকোচুরি খেলাতে তো তাই হয়। তাই না?

আরম্ভ হ'ল লুকোচুরি খেলা। একটু পরেই ওরা করল কি, মাকে খুঁজতে গিয়ে ওরা গাইতে আরম্ভ করল, 'কৃষ্ণ কাহ্নাইয়া দর্শন দে'।

সে কি ব্যাপার! মাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে, 'কৃষ্ণ কাহ্নাইয়া দর্শন দে'?

পরে ওদের মুখেই এর রহস্য শোনা গেল। ওরা বলল যে, মাকে খুঁজতে খুঁজতে, ওরা দেখে মা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিক দূর এগুতেই ওরা দেখে, কোথায় মা! মা তো নেই, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বংশীধারী কৃষ্ণ। মাথায় তাঁর শিখিপাখা, বর্ণ তাঁর উজ্জ্বল শ্যাম। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?

অনেক পরে মা এক জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলেন, —'লুকোচুরি খেলার সময় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মার খেয়ালে জেগেছিল কৃষ্ণ তো গোপ-গোপিনীদের নিয়ে এইভাবেই লুকোচুরি খেলতেন।'

তবে কি সেই খেয়ালেই মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন!

আর একবার মা এসেছেন কাশীতে। মা একদিন বসে আছেন। মা দেখছেন একটা বিকট মূর্তি মার দিকে এগিয়ে আসছে। সে সব কোনো কথা না বলে মা বললেন, —'ম্যালেরিয়া আসছে।'

মার কথা শুনে সবাই ভীতশংকিত হয়ে পড়ল। তবে কি এখানে ম্যালেরিয়া জ্বর আরম্ভ হবে? সত্যি সত্যি সেদিন রাত্রিতেই দেখতে দেখতে মার শরীরে দুরন্ত তাপ দেখা দিল। মার শরীর হি হি করে কাঁপছে। ঘটনাচক্রে সে দিনই সেখানে মার দর্শনে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। মায়ের ম্যালেরিয়া হয়েছে শুনে তিনি মাকে বললেন, —'মা তোমার এত জ্বর তোমাকে ঔষধ এনে দিই।' তাঁর কথা শুনে মা কি উত্তর দিলেন জানো? মা তাঁর দিকে তাকিয়ে মুখে হাসির ভাব এনে বললেন, —'সে কি কথা! মায়ের কাছে কেউ এলে তোমরা কি তাকে তাড়িয়ে দেবে? এই তো বাবা, তুমি এসেছ, এরা এসেছে, কাউকে কি আমি চলে যেতে বলছি? তেমনি ও—ও তো এসেছে, ওকে কেন তাড়িয়ে দেব। অতিথি এলে কি কেউ তাড়িয়ে দেয়?

উত্তর শুনে আমরা সবাই থ। ম্যালেরিয়া জ্বর যখন মার অতিথি, তখন সে সন্ন্যাসী আর কি করতে পারে। সত্যিই তো অতিথি এলে কি কেউ তাড়িয়ে দেয়!

আর একবার মা এসেছেন কাশীতে। মা আছেন কাশীতে মায়ের আশ্রমেই। আশ্রমের ঘর বাড়ী সংস্কার হচ্ছে। সে উদ্দেশ্যে আশ্রম প্রাঙ্গণেরই এক কোণে ইট, চুন, বালু, সুরকী আরো কত কি স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর ১॥০ টা। হঠাৎ মা খুব দ্রুত পদক্ষেপে এসে উপস্থিত হ'লেন সেই স্তূপীকৃত বালুরাশির কাছে। এসেই খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন,—'শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর এ পাশ থেকে বালু সরিয়ে দাও। এ কি করেছ তোমরা? এর নীচে দুটো গাছ দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে, সে দিকে তোমাদের কারো লক্ষ্য নাই?'

মার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে পাশ থেকে বালুগুলোকে সরিয়ে দেখা গেল, বাস্তবিকই তার নীচে চাপা পড়ে গেছে মেঝের ফাটল থেকে গজিয়ে ওঠা দুটো ডালিম চারা।

এখন এ রকম গাছ তো কতই জন্মায়, কে তার খেয়াল রাখে বলো।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা হ'ল ওখানে যে দুটো চারা গাছ আছে, মায়ের তো তা জানার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সেদিকে তিনি কখনো আসেন-ই নি। তাই সকলে একটু আশ্চর্য হয়েই মার কাছে তা জানতে চাইল। মা অত্যন্ত সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, —'বিছানায় সবে শরীরটা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দুজন এসে উপস্থিত, বলে,—'মা, বালু চাপা দিয়ে আমাদের দম বন্ধ করে মেরে ফেলেছে।'

বৃক্ষলতার এ জাতীয় অভিযোগ মার কাছে আরো বহু এসেছে। সেবার মা ঘুরছেন বিন্ধ্যাচল পর্বতে। হঠাৎ মা একটি গাছের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে সঙ্গীদের বললেন, —'এ গাছটার গোড়ায় একটু জল দাও তো।'

বিন্ধ্যাচল পর্বতে জলের বড় অভাব। তবুও মায়ের আদেশে অনেক নীচে একটা কূয়ো থেকে অল্প কিছু জল এনে দেওয়া হ'ল গাছের গোড়ায়।"

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এই যে, বিন্ধ্যাচল তো পাহাড়। কত শত শত বৃক্ষলতাই তো এদিকওদিক ছড়িয়ে আছে। এত গাছ থাকতে, হঠাৎ ওই গাছটিকে জলদানের খেয়াল মার কেন হ'ল ?

প্রসঙ্গক্রমে সে কথা মা একদিন বলেছিলেন। মা বলেছিলেন, 'ও গাছটি বহুদিন জল খেতে পায়নি, কয়েকবারই ও শরীরটাকে জানিয়ে ছিল।'

এ সব ঘটনার শেষ নেই। মা বলেন যে বৃক্ষলতা, পোকামাকড়, পশুপাখী, সব মার বন্ধু। তারা সর্বদাই মার কাছে যাওয়া আসা করে। আর ওরা যে অভাব-অভিযোগ জানিয়ে নালিশও করে, তার প্রমাণ তো পেলেই।

মার শরীরে যখন সাধনার খেলা চলছিল, তখনো এ জাতীয় ঘটনা অনেক ঘটেছে। মা বলেছেন, —'এমন একটা সময় গিয়েছে, যখন গাছের পাতা ছিঁড়লে, ডাল কাটলে এ শরীরটার গায়ে লাগত, শরীরটায় ব্যথা অনুভব হত।'

একবার একটা পিঁপড়ে মার গায়ের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে দেখে, উপস্থিত একজন সেটিকে ফেলে দিতে গেলে মা বললেন, —'ওটাকে কেন তাড়াচ্ছ ? শরীরটাকে ভালোবাসে বলেই তো এসেছে।'

প্রয়াগের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। প্রয়াগের আধুনিক নাম এলাহাবাদ। প্রয়াগ ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—এই তিন নদীর

সঙ্গম ঘটেছে সেখানে॥ ঐ তিনটি নদীকেই বলা হয় পূণ্য সলিলা। এই কারণেই প্রয়াগকে বলা হয় তীর্থরাজ প্রয়াগ।

একবার মা এসেছেন প্রয়াগ তীর্থে। মায়ের আগমন সংবাদ পেয়ে এক ভদ্রলোক মার কাছে এসে উপস্থিত।

তিনি মাকে বললেন যে তিনি স্বপ্নে এক দেবীর নিকট হ'তে একটা মন্ত্র পেয়েছিলেন। মন্ত্রটি দিয়ে দেবী তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এ মন্ত্র জপ করলে তিনি সব বিপদ থেকে মুক্ত থাকবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে মন্ত্র বিস্মৃত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে অনেক চেষ্টা করে-ও তিনি তা স্মরণে আনতে পারছেন না! তিনি নিত্য ত্রিবেণী সংগমে স্নান করেন এবং ঠাকুর দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন যেন সে মন্ত্র তাঁর স্মরণে আসে।

এ সব কথা বলে তিনি মার খাটের কাছে-ই বসে পড়লেন এবং মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন করুণার ভিখারী হয়ে।

মা এবং উপস্থিত সকলেই তাঁর কথা শুনলেন; এবং শোনার পর মা অন্যান্যদের সঙ্গে যেমন কথা বলছিলেন, বলতে লাগলেন।

একটু পরে হঠাৎ লোকটির কি হ'ল! তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, – 'মনে পড়েছে। মনে পড়েছে।' বলেই—মার কাছে এগিয়ে গিয়ে, বললেন,—'মা আশীর্বাদ কর আর যেন না ভুলি।' বলে তিনি খুব আনন্দিত মনে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক এ ভাবেই আর এক ভদ্রমহিলা তার গুরু-প্রদত্ত দীক্ষা মন্ত্র দীর্ঘদিন ধরে বিস্মৃত হয়েছিল। মা তার মস্তকে স্পর্শ করতে-ই সেই বিস্মৃত মন্ত্র তার ভেতরে জেগে উঠেছিল।

যাক এ জাতীয় ঘটনা আর কত বলব!

এই ভাবে মা দীর্ঘ ছয় দশকের ওপর ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর এই ভাবেই বৃক্ষলতা, পুষ্প, পশুপাখী থেকে আরম্ভ করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতিকে তিনি যে কল্যাণ ধারায় অভিসিক্ত করেছেন, তার কাহিনীর সামান্য কিছু তোমাদের শোনালাম। বড় হয়ে যখন আরো অনেক অনেক এ জাতীয় ঘটনা তোমরা পড়বে, তখন তোমাদের মনে এ প্রশ্ন-ই জাগবে—তবে এই মা আনন্দময়ী কে? তিনি যে কে সে সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতগণ কি বলেছেন তা

তোমাদের আগে শুনিয়েছি। এখন এ বিষয়ে তিনি নিজে কি বলেন তা তোমাদের শোনাই। তিনি বলেন,—

'আনন্দময়ী মা কে? আনন্দময়ই বা কে? তিনি ঘটে পটে সর্ব হৃদয়ে বিরাজিত।' তিনি আরও বলেন,—'আমি এখনো যা, আগে পরে-ও তাই। তোমরা যখন যে যা বল, বা যে যা ভাবো, আমি তাই। এ শরীরের জন্ম প্রারব্ধ ভোগের জন্য হয় নি। মনে করো না কেন, এ শরীর একটি ভাবের পুতুল। তোমরা চেয়েছ, তাই পেয়েছ।'—এ কথা তিনি বলেছিলেন ভাইজীকে।

তিনি আবার বলেন,—'মাকে জানা মানে মাকে পাওয়া, মা হয়ে যাওয়া। মা মানে আত্মা। মা মানে মা ময়।' এবার বল তোমরা কি কিছু বুঝলে তিনি কে? তাই মা চির রহস্যাবৃতা। এ ছাড়া আর কিছু-ই বলা যায় না। কেউ কিছু বলতে পারে না।

॥ দুই ॥

লীলাময়ী মায়ের লীলাময় জীবনের অসংখ্য ঘটনা থেকে কয়েকটি তোমাদের শোনালাম। দেখেইছ ঐ সব ঘটনাগুলি কেমন কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়বহ।

এবার শোনো মায়ের সঙ্গে কিছু সৎসঙ্গের কথা। মা তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে বিশ্ববাসীকে অসংখ্য সৎসঙ্গ দিয়ে গেছেন। সে সব সৎসঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানীগুণী, বহু সাধুসন্ন্যাসী ও মহাত্মাগণ। তাঁরা মায়ের সে সব সৎসঙ্গ পেয়ে সকলেই একবাক্যে বলে গেছেন যে মায়ের সৎসঙ্গে তাঁরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। সে সব অনেক জ্ঞানগর্ভ, বড় বড় কথা!

কিন্তু মা যে তোমাদের মত শিশু ও কিশোরদের নিয়েও অনেক সৎসঙ্গ করে গেছেন। এবার তার-ই মধ্য থেকে কয়েকটি সৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দিচ্ছি। দেখ তো মায়ের সৎসঙ্গ গুলো কেমন!

মা আছেন আলমোড়াতে। আলমোড়া পার্বত্য প্রদেশ। একবার ও দেশীয় কয়েকটি ছেলে মেয়েকে আনা হয়েছে মায়ের দর্শনে। তারা মাকে প্রণাম করতে-ই মা তাদের বসতে বললেন এবং মা নিজে-ও তাদের কাছে বসলেন।

তোমাদের পূর্বে-ই বলেছি যে মা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের তাঁর বন্ধু বলেন।

মা বসেছিলেন। বসে জিজ্ঞাসা করলেন,—'কি আমার বন্ধুরা তোমরা ভগবানের নাম কর তো? কেউ ঘাড় নেড়ে বলল 'হ্যাঁ', কেউ বলল 'না'।

যারা না বলেছিলো, মা তাদের বললেন,—'তোমরা ভগবানের নাম কর না? ঠাকুরের নাম যে করতে হয়।' এই বলেই যারা 'হ্যা' বলেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'তাই না বন্ধুরা।'

মা এমন একটা স্নেহের স্বরে এই কথা গুলো বললেন যে সব শিশুদের সংকোচভাব যেন নিমিষে নিঃশেষ হয়ে গেলো। উৎফুল্ল কণ্ঠে সবাই একসঙ্গে বলে উঠল—'হ্যাঁ' বলেই আর কথা নেই, কেউ বলতে আরম্ভ করল 'আমাদের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর আছে।' কেউ বলল মা, আমরে কাছে কালী ঠাকুরের এত বড় ছবি আছে।' বলেই হাত দিয়ে তার আকারও দেখিয়ে দিল। আবার কেউ বা বলল,—'আমাদের বাড়ী তো কাসার দেবীর কাছে। সেখানে মন্দিরে শিবঠাকুর, গণেশ ঠাকুর, অনেক ঠাকুর আছে?'

এ ভাবে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু বলল।

এবার মা বললেন,—'তাই তো! সকলের কাছে-ই ঠাকুর আছেন! তোমরা সবাই ঠাকুরকে ভালোবাসো না?'

একটি মেয়ে বলল,—'আমি বাবা মা দিদি ভালোবাসি। ঠাকুরের কাছে কীর্তন করি। প্রসাদ খাই।'

এই ভাবে দেখতে দেখতে মা তাদের পরমাত্মীয় হয়ে পড়লেন। নিঃসংকোচে তাদের সব সংবাদই তারা মাকে দিতে আরম্ভ করল।

তখন মা বললেন,—'বাঃ তুমি রোজ কীর্তন কর। আমাকে একটু শোনাও না!'

নিঃসংকোচে-ই সেই মেয়েটি গাইল, 'সীতারাম, সীতারাম।'

মা তখন সবাইকে-ই বললেন—'তোমরা-ও গাও।' তাদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে মা-ও যোগ দিলেন সেই গানে।

দেখা গেলো মাকে ঘিরে একটি কীর্তনের আসর। কেমন ছোট ছোট সব কীর্তনিয়া, সকলেই হাততালি দিয়ে মাকে ঘিরে বসে কীর্তন করছে।

কল্পনা করে দেখো তো সে দৃশ্যটি কেমন? আর সৎসঙ্গের দল? যাবার সময় দুই হাত ভরে ফল ও মিষ্টি।

আর একবার কাশীতে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর অল্প বয়স্কা কন্যা অসীমাকে। উদ্দেশ্য মাকে দর্শন করা।

ভদ্রমহিলাকে মার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি মাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে বললেন,—'মা, এর পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। আশীর্বাদ করে দাও যেন ভালো ভাবে পাশ করে মা।' বলে অসীমাকে এগিয়ে দিলেন মায়ের খাটের কাছে।

মা তার মস্তকে আস্তে আস্তে স্পর্শ করতে করতে বললেন,—'ভালো পড়লে ভালো পাশ, ভালো পড়লে ভালো পাশ।'

ভদ্রমহিলা আবার বললেন,—'মা ওর শরীরটাও ভাল থাকে না।'

মা—'তুমি ভগবানের নাম কর?'

অসীমা—'হ্যাঁ, করি।'

মা—'কি রকম করে কর। আমাকে শোনাও তো।' মার কথা শুনে অসীমা একবার তার মার দিকে ফিরে তাকাল। মার ইঙ্গিত পেয়ে ও গাইল,—'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।'

মা—'বাঃ তুমি সুন্দর কীর্তন কর তো। রোজ ভগবানের নাম করবে, সকালে আর বিকালে। ঘুম থেকে উঠে ভগবানকে বলবে ভগবান আমাকে ভালো করে দাও। সারাদিন আমি যেন খুব ভালো মেয়ে হয়ে থাকৃতে পারি। আবার শোবার সময় বিছানায় বসে বলবে,—'ভগবান সারাদিন যা করেছি, সব তোমাকে দিলাম। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কোরো। মনে থাকবে?'

অ—'হ্যাঁ।'

মা—'বেশ, আর মা-বাবার কথা শুনবে। খাবে খেলবে পড়বে আর আর কি করবে?'

অসীমা মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল নীরবে।

মা বললেন,—'আব, আর ঐ যে বললাম, রোজ ভগবানের নাম করবে। কেমন?'

অসীমা ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলো তা করবে।

এর ফল,—মালা, আর দুই হাত ভরা ফল-মিষ্টি।

আর একটি সৎসঙ্গে বসে মা শিশুদের বলছেন,—'তোমরা তো আমার বন্ধু ঠিক না ?'

বন্ধুরা বলল, 'হ্যাঁ'

মা—'তবে বন্ধুদের তো বন্ধুর কথা শুনতে হয়।'

'তাইতো ? তোমরা আমার বন্ধু, তোমরা আমার কথা শুনবে তো ?'

শিশুরা মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানাল।

মা—'বেশ, তবে তোমরা বন্ধুর এই কটি কথা মনে রেখো।'

এক নম্বর—'সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই ভগবানকে প্রণাম করবে। আর বলবে ভপবান, আমাকে ভালো ছেলে বা মেয়ে করে দাও। ভগবান আমি তো জানি না তুমি কোথায় থাক, আমাকে আশীর্বাদ কর আমি যেন তোমাকে দেখতে পাই। আবার রাত্রি বেলা শোবার সময়-ও ভগবানকে প্রণাম করবে। প্রণাম করে বলবে, ভগবান সারাদিন যদি আমি কিছু অন্যায় করে থাকি, কাল যেন আর না করি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।'

দুই নম্বর—'মা বাবা আর গুরুজনদের কথা শুনবে কিন্তু। কেমন ?'

তিন নম্বর—'খুব ভালো করে মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। ভগবানকে বলবে, ভগবান আমার যেন খুব বিদ্যা হয়।'

চার নম্বর—'সত্য কথা বলবে। মিথ্যা কথা বলতে হয় না।'

পাঁচ নম্বর—'খুব হাসবে, খেলবে, দৌড়াদৌড়ি করবে।'

ছয় নম্বর—'আর যখন এ গুলো সব হয়ে যাবে, তখন একটু একটু দুষ্টুমি করতে পার।'

মায়ের এই সব কথা শুনে ছেলে-মেয়েরা খুব খুশী হ'ল। যাবার সময় মাকে প্রণাম করে ফল ও মিষ্টি নিয়ে গেল।

একবার মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে এক ভদ্রমহিলা একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে এসেছে মার দর্শনে। ভদ্রমহিলা মায়ের কাছে এসে বসলেন, মার সঙ্গে তার কি প্রয়োজনীয় কথা আছে। মা তো বসলেন, কিন্তু ছেলেটি তার মাকে কিছুতেই বসতে দেবে না। কেবলই মার শাড়ীর আঁচল ধরে টানছে, আর আস্তে আস্তে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলছে,—'মা চল, মা বাড়ী চলল।'

ভদ্রমহিলা কেবলই ছেলেটিকে বলছেন—'এক্ষুনি যাব। একটু বোসো।'

কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই শুনবে না।

মা কিন্তু আগাগোড়াই ওকে দেখে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর মা ছেলেটিকে বললেন—কি বন্ধু? কোথায় যাবে?

ছেলেটি মার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পূর্বের মতই মার আঁচল ধরে টানতে লাগল।

তখন মা উপস্থিত এক সেবিকাকে বললেন,—'ওর হাতে একটা ফল দে তো!'

ফলটি পেয়েই ছেলেটি শান্তভাবে তার মার পাশে বসে পড়ল। আর একবারও বলল না, 'মা বাড়ী চল।'

ভদ্রমহিলার কথা শেষ হলে যাবার পূর্বে মাকে প্রণাম করে উঠে ছেলেটিকে বলল,—'প্রণাম কর।'

ছেলেটি শান্তভাবে উঠে দাঁড়াতেই মা বললেন, 'বন্ধু, আবার এসো।'

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে জানালো যে আবার আসবে। এই দেখে সেবিকাটি বলল,—'ফল দিয়েছ যে তাই আবার আসবে।'

মা বললেন—'সব কাজেরই ফল আছে তো।'

সেবিকা—'ওর কান্নার ফল।'

মা—'মায়ের জন্য কাঁদতে পারলে তার ফল তো মিলবেই।

এবার শোন আর এক অদ্ভুত সংসঙ্গের কাহিনী।

মা তখন কক্সবাজারে। কক্সবাজার সমুদ্রের তীরবর্তী একটি সহর। একদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে মাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মা আছেন বাড়ীর বাইরে একটি তাঁবুতে।

মা কোথাও গেলে যেমন হয় এখানেও তাই হয়েছে। নিকটবর্তী সব জায়গা থেকেই বহুলোক এসেছে মার দর্শন করতে। যুবক, বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা তো এসেছেনই, সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এসেছে অনেক। মা তাদের দেখতে পেয়েই ডেকে বললেন,—'এসো আমরা খেলা করি। একে তো সব ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, তার ওপর খেলার নিমন্ত্রণ! তার ফল কি, তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই! অবশ্যি বুঝিয়ে বলতে হ'ত যদি মা বলতেন, 'বই নিয়ে এসো আমরা লেখাপড়া করি!'

থাক্ মা যেই খেলার নিমন্ত্রণ দিয়েছেন, আর কি কথা আছে, প্রায় ২০।২২ জন ছেলেমেয়ে গুড়গুড় করে মার তাঁবুতে ঢুকে, একেবারে মাকে ঘিরে যার যার জায়গা নিয়ে বসে পড়ল।

মা বললেন,—'তোমরা সবাই খেলবে ?'

সবাই সমস্বরে বলে উঠল,—'হ্যাঁ।'

মা—'বেশ তবে শোন আগে খেলার নিয়ম। ভালো করে বুঝে নাও। খেলার নাম হ'ল সচ্চিদানন্দ খেলা। এতে দুটি দল থাকবে। যারা হারবে তাদের প্রত্যেককে ১০৮ বার করে ভগবানের নাম জপ করতে হবে। এই খেলা হয় কড়ি দিয়ে। এতে সাতটা কড়ি থাকে।

পূর্বেই বলেছি কক্সবাজার সমুদ্রের ধারে, সমুদ্রের ধারে বালুর ওপর অজস্র কড়ি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তা তোমরা জানই। যাক কড়ি ওখানেও ছিল। এবার খেলা আরম্ভ হবে।

খেলাটা হ'ল,—সাতটা কড়ি হাতে নিয়ে প্রতি দলের প্রত্যেকে কড়িগুলো ছড়িয়ে খেলবে। যে দলের সকলের চিৎ হয়ে পড়া কড়ির সংখ্যা বেশী হবে সে দলই জিতবে। তার সঙ্গে সঙ্গে অপর দলকে আসন করে বসে জপ আরম্ভ করতে হবে। সকলের জপ শেষ হলে আবার খেলা হবে, আবার যারা হারবে, আবার তারা জপ করবে—এই ভাবেই চলবে খেলা।

যাক সবই হলো। খেলোয়াড় সব উপস্থিত, কড়িও এসে গেছে। নিয়ম-কানুনও জানা হয়ে গেলো। এখন চাই একজন রেফারী—যে সংখ্যাগুলো গুণে বলবে কোন দল হারল, আর কোন দল জিতল। কিন্তু রেফারী হবে কে ?—এই নিয়েই দাঁড়াল সমস্যা।

এদিকে মাকে নিয়েও দাঁড়িয়েছে আর এক সমস্যা। দু'দলই মাকে বলছে, 'আপনি আমাদের দলে, আপনি আমাদের দলে।' এখন মা যাবেন কোন দলে ?

শেষ পর্যন্ত মা-ই তার সমাধান করলেন। মা বললেন, তিনি তো আর দু দলে থাকতে পারবেন না। তাই তিনিই হবেন রেফারী। অবশ্যি তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে সঙ্গে একজন তাঁর লোক থাকবে।

দু দলই কথাটা মেনে নিল। এবার খেলা আরম্ভ হ'ল।

যেবার যে দল হারে, তাদের মা জপে বসতে বলেন। তিনি যে রেফারী তাই সব বিষয়েই তো তাঁকে দেখতে হবে। সকলে জপ করছে কিনা তাও যেমন তিনি তাঁর লোকের সাহায্য নিয়ে দেখছেন, তেমনি জপে বসার নিয়ম, আঙ্গুলে ১০৮ সংখ্যা রাখার নিয়ম ঠিক হচ্ছে কিনা তা-ও তিনি দেখছেন।

এই ভাবে কিছুক্ষণ খেলা হ'ল—মার সঙ্গে খেলতে পেয়ে ছেলে-মেয়েরা কি খুশী!

মা যখন চলে আসবেম, সবাই একসঙ্গে মাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলছে,—'মা, আবার কবে আসবেন। এবার কিন্তু অনেকক্ষণ খেলতে হবে। এত অল্প সময় হলে হবে না।—এ জাতীয় আরো কত কথা, কত অবদার।

এবার বল এটা একটা নতুন ধরণের সৎসঙ্গ কিনা? এতে খেলা আছে। ভগবানের নাম জপ করা আছে। জপে ধ্যানে বসার নিয়ম শেখা আছে। জপের সংখ্যা আঙ্গুলে কি করে রাখে, তা শেখা আছে। আর কি আছে? আর আছে মায়ের কাছে বসে, মায়ের কথা শুনে জপের অভ্যাস করা।

আবার আর এক ধরণের সৎসঙ্গও মার কাছে হয়েছে। তার-ও একটু নমুনা তোমাদের জানিয়ে দি।

এ সৎসঙ্গকে বিশদ করে বলা যায় কবিতার সৎসঙ্গ। অর্থাৎ মার মুখে ছন্দোবদ্ধ ভাবে সৎসঙ্গের উত্তর। এ-ও এক বিচিত্র ব্যাপার।

একদিন মা আলমোড়াতে বসে আছেন। মায়ের খুব প্রসন্ন ভাব। মার কাছে বড় ছোট অনেকেই বসে আছেন। অনেকে মাকে নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। মা-ও তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এবার শোন সে সব প্রশ্নের কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর।

এক ভদ্রলোক মাকে প্রশ্ন করছেন,—'মা, আমার ছেলের তো বয়েস হয়ে গেলো—এখন তো 'পৈতে দেওয়া দরকার। তুমি কি বল?'

মার হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল। তিনি একবারে কবি হয়ে গেলেন। কবিতার কথা কইতে আরম্ভ করলেন। মা উত্তর দিলেন।—

'কি আর আছে কইতে?
দাও না এবার পৈতে।'

বলে আবার নিজে-ই হাসতে লাগলেন। এটা কিরকম হ'ল জানো। ঠিক তোমরাও যেমন কখনো কখনো কোন কথা বলে আপন মনেই খুশী হয়ে ওঠ। মাকে তখন ঠিক মনে হচ্ছিল তোমাদের মত অল্প বয়েসি একটি মেয়ে। আর সত্যি-ই তো তাই। নইলে কি আর তোমাদের বন্ধু বলে ডাকেন ?

এর পর থেকে সে দিন মা যতক্ষণ সৎসঙ্গে বসেছিলেন সকলের সঙ্গে-ই কবিতায় কথা কইতে লাগলেন।

এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে—প্রায় এগারটা বাজে। মাকে ছেড়ে কেউ উঠতে-ই চায় না, সবাই বসে-ই আছে। তাই মা বললেন,—

'করছ কি আর বসিয়া ?
নগরে সব পড়েছে যে শুইয়া।
তোমরা শুতে যাবে না নাকি ?
আরো কিছু বলার বাকি ?'

মার কথা শুনে একজন বলছেন—'মা, এখান থেকে উঠে যেতে তো মন চায় না।

মা বললেন,—'না চাইলে কি হবে ?
শুতে তো যেতে-ই হবে।'

এ কথা বলে মা নিজে ই উঠতে যাবেন। একজন বলল, 'মা, আর একটু বসুন না।'

মা বললেন,—'বসব না এখন।
করি গিয়া শয়ন॥'

এক সেবিকা সেখানে উপস্থিত ছিলো। মা শুতে যাবেন শুনে সে বলল,—'তবে যাই মশারি ঠিক করে দিয়ে আসি।

মা উত্তর দিলেন,—'মশারি লাগিবে না ঠিক করিতে।
আমি শুইব বেশ প্রীতিতে।'

মা উঠে যাচ্ছেন দেখে এক ভদ্রমহিলা বললেন, 'মা চন্দনার বাবা তোমাকে চিঠি দিয়েছে, 'সংসারের চিন্তায় চিন্তায় তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, কি যে করবে কিছু-ই বুঝে উঠতে পারে না। তাকে কি লিখব ?'

সঙ্গে সঙ্গে-ই মা বলে উঠলেন,

'সর্ব চিন্তা পরিহরি
বলতে বল 'হরি হরি' ।'

এই বলে মা উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বলছেন—

'বিগত বৃথা আশা
বল কেন কর আশা !
চল চল নিজ বাস,
আর কোরো না সর্বনাশ ।'

এই হল আর এক ঢং এর সৎসঙ্গ ! বলতো কেমন লাগল সৎসঙ্গটাকে ?

ইতিপূর্বে মায়ের কাছে শোনা কয়েকটি গল্প তোমাদের শুনিয়েছি। তখন-ই বলেছি যে মায়ের কাছে গল্প আছে ঝুড়ি ভরা। এবার সেই থেকে আরো কয়েকটি গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি। তবে এবারকার গল্পগুলো শুধু গল্প-ই নয়— এদের বলে প্যারাবোল। প্যারাবোলটা কি জান ? এটা গ্রীক শব্দের ইংরেজী রূপান্তর—এর মানে হচ্ছে নীতিগর্ভ রূপক গল্প অর্থাৎ এ জাতীয় গল্পের ভেতর দিয়ে কোন আদর্শ বা কোন নীতি সরল করে বোঝান হয়। মার বলা সব গল্প-ই প্রায় তাই, তবু-ও এগুলো তার মধ্যে-ও বিশেষ ধরণের।

একবার এক ভদ্রলোক এসে মাকে বলছেন,—'মা কত-ই সাধু-মহাত্মার সঙ্গ করলাম কিন্তু কই কিছু-ই তো হলো না ।'

কথাটা শুনে মা বললেন,—'কিছুই হচ্ছে না ? আচ্ছা একটা গল্প শোনো ।'

এই বলে মা গল্প আরম্ভ করলেন :

'টলটলে জলের এক দীঘি। সেই দীঘিতে ফুটে আছে সুন্দর একটি পদ্মফুল। মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝোঁকে পদ্মটি বেশ দুলছে।

দীঘিটির পাশ দিয়ে-ই এক রাস্তা,—সেই রাস্তা ধরে চলেছে এক পথচারী। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল ঐ পদ্মফুলটির ওপরে। ইতিপূর্বে কখনো সে আর পদ্মফুল দেখেই নি। তাই অমন সুন্দর ফুলটি দেখে সে দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল—কি সুন্দর ফুলটি, কিন্তু এটি কি ফুল ?

সে চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল, যদি কাউকে দেখতে পায় তবে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানবে, ওটি কি ফুল। কিন্তু না, ওর আশে পাশে কোথা-ও কেউ নেই।

হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ঠিক ঐ ফুলটির নীচেই জলের মধ্যে ভাসছে একটি ব্যাং আর একটি মাছ। পথিকের মনে একটু আশা জাগল—ওদের কাছ থেকে-ই জানা যাবে ফুলের নাম। ওরা যখন এখানে-ই থাকে তখন ওরা নিশ্চয়-ই তা বলতে পারবে।

তাই লোকটি প্রথমে ব্যাংটাকে-ই ডেকে জিজ্ঞাসা করল,—'এই ব্যং, তোমার মাথার ওপরে ওই যে সুন্দর ফুলটি ফুটে আছে, ওটি কি ফুল ?

ব্যাং তো প্রথমে তার কথা কানে-ই তুলল না। তারপর পথিক বার কয়েক চেঁচামেচি করাতে সে রেগে গিয়ে বলল,—'কে জানে ওটা কি ফুল! আর ওটার মধ্যে জানার আছে-ই বা কি? বলেই সে তার খাদ্য পোকামাকড়ের খোঁজে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটির বড় দুঃখ হ'ল ব্যাং এর ব্যবহারে। সে মনে মনে বলল, ব্যাংটার ভদ্রতা জ্ঞান একেবারে-ই নেই। কেউ কিছু জানতে চাইলে অন্ততঃ তার কথার উভয়টাও যে ভালো ভাবে দিতে হয় ওই ব্যাংটা তাও শেখে নি! বড়-ই অভদ্র তো। ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্যাং তো তার নাগালের বাইরে। কাজে-ই কি আর করা।

এবার পথিকটি মাছটিকে ডেকে বলল,—'ভাই, মাছ ফুলের নামটি কি ?'

মাছটি ও তার কথা শুনে রেগেই আগুন। বলে,—'এক্ষুনি শুনলে না ব্যাং বন্ধু কি বলে গেল। আবার আমাকে কি জিজ্ঞেস করছ? ও ফুল তো হরদমই ফোটে। ওর আবার জানার কি আছে? যত সব···।' রাগের চোটে সে তার কথাটাকে-ও শেষ করতে পারল না। এবং ওই বলে-ই সে-ও গভীর জলে তলিয়ে গেলো।

লোকটি দুঃখিত হয়ে ভাবল—দুর্ ছাই, ও ফুলের নাম আর জেনে দরকার নাই। এই ভেবে সে চলেই যাচ্ছিল।

হঠাৎ সে দেখে তীব্র বেগে একটা মৌমাছি পদ্মফুলটার দিকে উড়ে যাচ্ছে। লোকটি মৌমাছিকে দেখে-ই আবার দাঁড়াল। হাত তুলে বলল,—'আরে ভাই মৌমাছি, একটা কথা শুনে যাও না ভাই।'

কিন্তু মৌমাছি উড়ে যেতে যেতে ই খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বলল,—'দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন আমার তো সময় নেই, তুমি একটু অপেক্ষা কর, এক্ষুনি তোমার

কথা শুনছি।' এই বলেই সে উড়ে গিয়ে বসল একবারে পদ্মফুলটির ওপরে। বসেই পদ্মফুলের মধু সে প্রাণ ভরে পান করতে লাগল।

লোকটি তো দাঁড়িয়েই আছে। সে অবাক হয়ে দেখছে মৌমাছিটার কাণ্ড কারখানা।

যাক্ বেশ কিছুক্ষণ মধু পান করবার পর মৌমাছি উড়ে এল লোকটির কাছে। বসল একটা ছোট গাছের ডালে। বলল,—'হ্যাঁ ভাই, এবার বল তুমি কি বলছিলে?'

মৌমাছি তার কথা শুনেছে দেখে লোকটি খুব খুশী হয়েছে। সে খুব আনন্দের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—'কি বলছিলাম জানো? বলছিলাম ওটি কি ফুল? আর তুমি এতক্ষণ ওখানে কি করছিলে?'

মৌমাছিটি কিন্তু ব্যাং বা মাছের মত অভদ্রতা করল না। খুব আনন্দের সঙ্গে বলল,—'সে কি, তুমি এ ফুলের নাম-ই জান না? ওর নাম পদ্মফুল। আর ওর বুকে যে মধু ভরা। আমি তো এতক্ষণ তাই পান করছিলাম। দেখছ না মধু খেয়ে আমার চোখে মুখে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি!'

এই বলেই মা গল্পটি শেষ করলেন!

আশাকরি বুঝেছ মা কি উত্তর দিলেন ভদ্রলোকের প্রশ্নের! মা বললেন,—সাধু মহাত্মার কাছে গেলেই, আর সৎসঙ্গে গিয়ে বসলেই কি সৎসঙ্গ করা হয়? সৎসঙ্গের ফল পেতে হলে, সৎসঙ্গীকে প্রথমে অধিকারী হতে হবে। অধিকারী না হ'লে ঐ ব্যাং আর মাছের মত পাশাপাশি বাস করেও মধুর সন্ধান তারা পাবে না। আর অধিকারী হলে মৌমাছির মত বহু দূরে বাস করেও একবার তার সঙ্গ পেলেই সে মধুময় হয়ে ফিরে যেতে পারে।'

প্রেম ও প্রীতি—এই যে দুইটি শব্দ এর মধ্যে আছে অসীম ক্ষমতা, অসীম শক্তি। অর্থাৎ প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে মানুষের জীবনে আনতে পারা যায় আমূল পরিবর্তন, বা অন্য কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। চোরকে সাধু, মন্দকে ভালো, অসৎ কে সৎ করে তুলতে প্রেম ও ভালবাসার শক্তির তুলনা নেই। অর্থের লোভ দেখিয়ে শাসন করে ভয় দেখিয়ে কিন্তু তা করা যায় না। কারণ প্রেম ও ভালবাসা মানুষের অন্তরটাই পরিবর্তন করে দেয়।

এই সত্যটাকেই মা খুব সুন্দর একটা গল্প বলে বুঝিয়ে দেন—শোন সে গল্পটা।

একটা চোর এক মহাজনের বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকেছে। চোরটির দুর্ভাগ্য যে চোরটি যে ঘরে ঢুকেছে, সে সময় মহাজন সে ঘরে-ই উপস্থিত। চোরটাকে ঢুকতে দেখেই মহাজন তো চুপিচুপি পেছন থেকে গিয়ে চোরটাকে জড়িয়ে ধরেছে। জড়িয়ে ধরেই সে চোরটাকে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলেছে, আর বলছে—'আমার ঘরে চুরি, চল এবার জেলে।'

ধরা পড়ে চোরটা প্রথমে তো বুঝতেই পারল না যে এ কি হ'ল। পরে যখন্য সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন সে দেখল, সর্বনাশ হয়েছে। সে ধরা পড়েছে, আর তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এ কথা বুঝতে পেরেই সে তো ভয়ে একেবারে অস্থির। ভয়ে ভাবনায় সে চীৎকার করে কাঁদতেই আরম্ভ করল—আর বলতে আরম্ভ করল,—'হুজুর আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আর কোনো দিন চুরি করব না। আমাকে এবার ক্ষমা করুন। আমাকে জেলে দেবেন না।'

এই বলতে বলতে চোরের সে কি কান্না!

মহাজন লোকটি কিন্তু খুব ভালো ও সরল প্রকৃতির ছিল। চোরটার সেই করুণ কান্না শুনে মনটা তার গলে গেল। তবুও সে বলল,—'জেলে দেব না? নিশ্চয়ই দেব। চুরি করলে জেলে যেতে হয়, তা জানিস্ না? কেন চুরি করতে এসেছিলি?'

চোর তো তার কথা শুনে আরো জোরে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল,—'হুজুর কেন চুরি করতে এসেছিলাম? আমি সব বলছি, আমি স-ব বলছি। আমাকে ছেড়ে দিন।'

মহাজন তখন চোরটাকে বলল,—'বল, কি বলবি?'

চোর বেচারা কাঁদতে কাঁদতেই তার কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল। সে বলল—

'হুজুর, আমি বড় গরীব। আজ সাত দিন আমি, আমার ছেলে, মেয়ে ও বৌ—কারো পেটে একটি দানাও পড়েনি। এভাবে থাকলে আমরা আর ক'দিন বাঁচব! ২।৩ দিনেই মরে যাব যে। তাই পেটের জ্বালায়, আর বাচ্চাগুলোর করুণ চীৎকারে আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। চুরি করতে বেরিয়েছি।' বলেই আবার তার সে কি কান্না।

ওর অবস্থা দেখে আর কথা শুনে মহাজনের খুব দয়া হল। আহা ও এত দরিদ্র। বাচ্চাগুলোও না খেতে পেয়ে মরে যাবে, ভাবতেই মহাজনের মনটাও যেন কেমন করে উঠল।

সে চোরটিকে ছেড়ে দিয়ে বলল,—'তোর এই অবস্থা? আহা! তবে তুই এক কাজ কর। দেখ ঐ যে বড় বাক্সটা, ওটা আমার স্ত্রীর বাক্স। ওর ভেতরে হীরের একটা বড় আংটি আছে। ওটা আমার স্ত্রীর বিশেষ কাজে লাগে না। তুই ওই আংটিটা নিয়ে পালিয়ে যা। শীগ্‌গীর কর। আমার স্ত্রী এলো বলে। সে এসে গেলে কিন্তু আর পালাতে পারবি না।'

চোরটা মহাজনের কথা শুনে প্রথমে তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না। খানিকক্ষণ তো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েই রইল মহাজনের দিকে। একটু পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেল বাক্সটার দিকে। বাক্সটা খুলে দেখে সত্যিই তো তার মধ্যে রাখা রয়েছে বেশ বড় একটা হীরের আংটি। আংটিটা দেখে তো তার চক্ষু চড়ক গাছ!

চোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহাজন তাড়া দিল, আংটিটা নিয়ে আয়, শীগ্‌গীর পালা।

চোর আর কাল বিষম্ব না করে আংটিটি নিয়েই এক মুহূর্তে অন্তর্ধান।

চোর পালিয়ে যেতেই মহাজনের স্ত্রী তো ঘরে এসে হাজির। এদিকে ব্যস্ততার মধ্যে চোর বাক্সটাকে খোলা অবস্থায় রেখেই পালিয়েছে।

স্ত্রী তো ঘরে ঢুকেই দেখে তার বাক্স খোলা। এ কি ব্যাপার। তার বাক্স খুলল কে? ওর মধ্যে যে তার বহু মূল্যের হীরের আংটিটি আছে। সে কথা মনে পড়তেই সে ছুটে গিয়ে দেখে, বাক্সে তার হীরের আংটি নেই। দেখেই সে চীৎকার করে উঠল,—'ওগো আমার সর্বনাশ হয়েছে গো, 'আমার হীরের আংটি চুরি হয়ে গেছে। আমি কি উপায় করব—এই সেদিন পনের হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম! আমি এখন...'

মহাজন আংটির দাম শুনে, আর তার স্ত্রীর অবশিষ্ট কথা শোনারই সময় হ'ল না।

সে বলে উঠল,—'বল কি? পনের হাজার টাকা! আমি তো জানতামই না যে ওর দাম এত বেশী।' বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেলো চোরের পালানো পথে।

একেবারে হন্তদন্ত হয়ে প্রাণপণে দৌড়ে বেশ কিছুটা দূর গিয়ে সে চোরটার দেখা পেল। দেখা পেয়েই বলল,—'এই, এই শোনো, আমি বলতে এলাম ঐ যে আটিংটা তুমি চুরি করে এনেছ ওটার দাম কিন্তু পনের হাজার টাকা! ওটা যেন অল্প দামে কেউ তোমাকে ঠকিয়ে না নেয়। মনে রেখো কিন্তু!'

বলেই মহাজন বাড়ীর দিকে দৌড়ে ফিরে গেল।

আর চোর? কোথায় মহাজনকে আসতে দেখে সে ভেবেছিল, এবার জেলে যেতেই হবে, তার পরিবর্তে মহাজন যা বলল তা শুনে তার দু'চোখে তখন অশ্রুর ধারা। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল,—ভগবান, মানুষের হৃদয়ে এত প্রেম, এত ভালবাসা!

সে মুহূর্ত থেকে সে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ!

তোমরা তো ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছ, মানুষের ভাগ্যে যা লেখা থাকে তা হতেই হবে। এ কথাটাকেই আবার আমরা অনেক সময় এভাবেও বলি যে, বিধির বিধান অলঙ্ঘ্য।

একবার এক ভদ্রলোক মাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন যে, 'মা, কপালের লেখা কি খণ্ডান যায় না?'

মা বললেন,—'না, ভগবানের বিশেষ কৃপা না হলে ললাট-লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। যে ভাবেই হোক কপালে যা লেখা, তা ঘটবেই।'

একথা বলেই মা আবার বললেন, কি রকম শুনবে? শোন—

এক দেশে এক ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন সে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ কি একটা শব্দ শুনে, তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গতেই সে চেয়ে দেখে একটি মস্ত বড় সাপ তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে দংশন করে চলে যাচ্ছে তারই পাশ দিয়ে। আর সাপের সেই দংশনে তার চোখের সামনে মরে পড়ে আছে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা।

এই না দেখে শোকে-দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে ব্রাহ্মণ ছুটল সাপের পেছনে, তাকে মারতে।

সবে সে কিছু দূর গিয়েছে, সে দেখে কি, কোথায় সে সাপ! সাপ তো নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো বলীবর্দ, ষাঁড়। মাথায় তাদের লম্বা লম্বা শিং।

দেখতে দেখতে সেই দুটো ষাঁড়ে বেঁধে গেল লড়াই। ব্রাহ্মণ তো কাণ্ড দেখে ভয়ে দশ পা পেছিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে সে লড়াই দেখতে লাগল। কিন্তু সে লড়াই বেশীক্ষণ চলল না। একটু সময় পরেই ব্রাহ্মণ দেখলো দুটো ষাঁড়ই লড়াই করতে করতে মরে পড়ে গেল। আর সেই ষাঁড় দুটোর জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে। এই সব ব্যাপার স্যাপার দেখে ব্রাহ্মণ তো একেবারে অবাক! একি ভোজবাজী নাকি?—ভাবল ব্রাহ্মণ।

কিন্তু ভোজবাজী এখনো শেষ হয়নি। এরই মধ্যে ব্রাহ্মণ আবার হঠাৎ দেখে সেই মেয়েটাকে পাবার জন্যে দুটি যুবক কোথা থেকে এসে উপস্থিত। মেয়েটিকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল বচসা। বচসা হতে হতেই তারা দুজনে দুটো ভোজালি বার করে লড়াই আরম্ভ করে দিল। এবং দেখতে দেখতে দুজনেই দুজনের বুকে ভোজালি বসিয়ে দিয়ে—দুজনেই মরে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দরী মেয়েটি একদিকে চলতে আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণ তো ভেবেই উঠতে পারছে না, তার চোখের সামনে এসব সে কি দেখছে।

এদিকে মেয়েটি অনেকটা এগিয়ে গেছে—এই দেখে ব্রাহ্মণও ছুটল তার দিকে।

ব্রাহ্মণকে দৌড়ে আসতে দেখে মেয়েটি একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বলল,—'কেন তুমি এ দিকে আসছ? পালাও এখান থেকে।'

ব্রাহ্মণ এতক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে! সে বলল, 'কেন পালাব? তুমি কে আগে আমাকে বলো। প্রথম দেখলাম তুমি একটা শয়তান সাপ, আমার সম্পূর্ণ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করেছ। পরক্ষণেই আবার দেখি তুমি দুটো ষাঁড় হয়ে লড়াই আরম্ভ করে দিলে, এমন কি লড়তে লড়তে মরেও গেলে। কিন্তু একটু পরে দেখি তুমি মোটে-ও মর নি—ঐ দুটো লোককে মারবার জন্যে দিব্যি সেজেগুজে সুন্দর একটা মেয়ে হয়ে এসে হাজির হয়েছ। আবার আমাকে বলছ চলে যেতে। কেন যাব? মোটেই যাব না। আগে বল তুমি কে?'

ব্রাহ্মণের এই সব কথাবার্তা শুনে, মেয়েটি খুব রেগে গেল। রেগে গিয়ে বলল,—'আমি কিছু শুনতে চাই না। তুমি যাবে কি না বল।'

ব্রাহ্মণ, একে তো ওর পরিবারের শোকে পাগল, তার ওপর আবার এই ধমকানি। সে বলল,—'কক্ষনো যাবো না। তোমাকে বলতেই হবে তুমি কে?'

মেয়েটি দেখল ব্রাহ্মণ তো নাছোড়বান্দা। তাই বাধ্য হয়েই সে বলল, আমি কে বলতেই হবে? তবে শোনো আমি নিয়তি। তুমি কেন বৃথা আমাকে দোষারোপ করছ। আমি কাউকেই মারি না। আমি তো ভাগ্যবিধাতা। যার যার কর্ম অনুসারে সে মরে। আমি মারব কেন? আমি শুধু প্রতিটি মানুষের কর্মের ফল তার কপালে লিখে দিয়ে যাই। এ ছাড়া আমি আর কিছুই করি না।'

ব্রাহ্মণ বলল,—'আচ্ছা, তাই বুঝি। আচ্ছা তবে দেখতো আমার কপালে কি লিখেছ? আমি কি করে মরব?'

মেয়েটি ওর কপালের দিকে তাকিয়ে বলল,—'তুমি? তুমি জলে ডুবে মরবে।' বলেই মেয়েটি অন্তর্ধান হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ মেয়েটিকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার বলা আর হ'ল না। বলবে কাকে? মেয়েটি তো অন্তর্ধান হয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ সেখানে দাঁড়িয়েই কতক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর মনে মনে বলল, আমাকে জলে ডুবে মরতে হবে? কখনোই না। ওই শয়তান মেয়েটার কথা কিছুতেই সে মানবে না। সে দেখিয়ে দেবে ও সব নিয়তি ফিয়তি কিছু নয়। সে এখন থেকে জলের ধার কাছ দিয়েই যাবে না। দেখি সে কেমন জলে ডুবে মরে!

যাক, এ সব ভেবেচিন্তে তো ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরে এলো। ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী মরে পড়ে আছে, তাদের সংকার ও শ্রাদ্ধশান্তি করল। তারপর বাড়ী-ঘর-দুয়ার বিক্রি করে দিয়ে, পাহাড়ের ওপরে গিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে থাকতে লাগল। পাহাড়ে তো আর পুকুর, নালানদী, সাগর ওসব নেই। সে দেখবে ঐ শয়তান মেয়েটা যা লিখেছে তা কেমন করে সত্যি হয়।

দিন কাটতে লাগল। ব্রাহ্মণ ঘুরেফিরে পাহাড়ের ওপরেই থাকে। নীচে নদী-নালার দেশে আর সে নামে না।

একদিন ঐ ভাবেই ব্রাহ্মণ ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সে দেখে দূরে, পাহাড়ের আরো ওপরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীটা দেখে ব্রাহ্মণের মনে হ'ল, ওটা বোধ হয় কোনো রাজা মহারাজের গ্রীষ্ম-নিবাস। বাড়ীটা দেখে ব্রাহ্মণ ভাবল, আর কতদিন এই ভাবে যাযাবরের মত থাকা যায়। ওখানে গেলে হয়ত তার থাকার একটা ব্যবস্থা হতেও পারে। আর ওখানে নদী-নালার তো কোন প্রশ্নই নেই, সে তো পাহাড়ের আরো অনেক ওপরে।

এই সব ভেবেচিন্তে ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়ে উপস্থিত।

গিয়ে দেখে, ব্রাহ্মণ ঠিকই ভেবেছিল। বাড়ীটা এক রাজা মহারাজার মতই ধনী লোকের বাড়ী।

ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হতেই একেবারে বাড়ীর মালিকের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। বাড়ীর মালিক ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বেশ খুশীই হলেন। তিনি খুশী হলেন এই ভেবে যে প্রথমতঃ তিনি দেখছেন, ব্রাহ্মণটি বেশ ভদ্র ও বিদ্বান। দ্বিতীয়তঃ এই ব্রাহ্মণটিকে যদি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের অভিভাবক-শিক্ষক নিযুক্ত করা যায় তবে মন্দ হয় না। এই জাতীয় আরো অনেক কথা ভেবে তিনি ব্রাহ্মণের নিকট সে প্রস্তাব করতেই ব্রাহ্মণ তো আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। সে তো তাই চাইছিল। তার এই যাযাবর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কি হতে পারে।

এই ভাবে ব্রাহ্মণ সেখানেই রয়ে গেল।

ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যে ও ব্যবহারে সকলেই খুশী। বিশেষ করে গৃহস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র তো তার একান্ত অনুগত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণকে ছেড়ে সে একদণ্ডও থাকতে চায় না। তার খাওয়া-শোওয়া, গল্প-গুজব, ঘোরাফেরা সব 'অমা'র সঙ্গেই। ছেলেটি ব্রাহ্মণকে 'অমা' বলেই ডাকে।

এইভাবে ওদের দিনগুলো পরম সুখেই কেটে যাচ্ছিল।

এরই মধ্যে একদিন সূর্যগ্রহণের স্নান উপলক্ষ্যে সকলের কাশী যাওয়ার কথা উঠল। ব্রাহ্মণের সে কথা শুনে তো মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ল। আবার সেই নদী। না, কাশী যাওয়া তার কিছুতেই সম্ভব নয়। শয়তান মেয়েটা……

ব্রাহ্মণ এই সব নানান কথা চিন্তা করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল গৃহস্বামীর

কাছে! স্পষ্ট ভাষায় সে জানিয়ে দিল যে তার পক্ষে কাশী যাওয়া অসম্ভব। এবং কেন অসম্ভব তাও জানিয়ে দিল সম্পূর্ণ অকপটে।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে। তার ধনুর্ভাঙ্গাপণ—'অমা' না গেলে, সে কিছুতেই যাবে না। এই বলে সে স্নানাহার ত্যাগ করে, চীৎকার করে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল।

তবে উপায়? অবস্থা দেখে গৃহস্থ সকলেই ব্রাহ্মণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করতে লাগলেন। এবং শেষ পর্যন্ত গৃহস্বামী বললেন, 'কাশী গেলেই' আপনাকে স্নান করতে হবে, এমন তো কোন কথা নেই। ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্যেই আপনার কাশী যাবার প্রয়োজন।'

কথাটা ব্রাহ্মণের মনে ধরল। গৃহস্বামীর অনুরোধে তাই শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ কাশীতে যেতে স্বীকৃত হলেন।

সূর্যগ্রহণের স্নানযোগ। কাশীর ঘাটে ঘাটে শত সহস্র লোকের ভীড়। সকলেই স্নান করে নিজেকে পাপমুক্ত, কৃতকৃতার্থ অনুভব করছে।

গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে বললেন,—'দেখুন আপনিও ইচ্ছা করলে গঙ্গার ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়েই একটা ডুব দিয়ে নিতে পারেন। এ সুযোগ কি জীবনে বার বার আসে! এত শত সহস্র লোক স্নান করে ধন্য হচ্ছে।

ব্রাহ্মণেরও মনটা কেমন কেমন-ই করছিল। এত শত সহস্র লোক স্নান করে ধন্য হচ্ছে। নাঃ, গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে শুধু একটা মাত্র ডুব দিয়েই...ভাবতে ভাবতে তিনি গঙ্গার ঘাটের মাত্র দ্বিতীয় সিঁড়িতে নামতেই তার হাতে ধরা গৃহস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র চক্ষের পলকে একটি কুমীরের আকার ধারণ করে—তাকে টানতে টানতে মাঝ গঙ্গায় নিয়ে চলে গেল। নিয়ে যেতে যেতে বলল,—'ঠাকুর আমি নিয়তি, এই দেখ।' ডুবন্ত ব্রাহ্মণ শুধু একবার দৃষ্টি মেলে দেখেন,—সেই শয়তান মেয়েটা!

গল্প শেষ করে মা বললেন,—'এই হ'ল নিয়তির খেলা। ললাট লিখন, কে করে খণ্ডন।

এবার শোন এক চতুর ব্যবসায়ীর গল্প।

অনেক যুগ আগের কথা, এক ছিল ধনী ব্যবসায়ী। সে যাবে ব্যবসা করতে বহু দূর দেশে। এক চোর কি করে এই সংবাদ জানতে পেরে সে নিজেও এক ব্যবসায়ী সেজে ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। বলে,—'আরে

ব্যবসায়ী ভাই, তুমিও তো ব্যবসা করতে যাচ্ছ, আমিও যাচ্ছি। ভাবলাম এত ধনরত্ন নিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না। তাই তুমিও ব্যবসা করতে যাচ্ছ শুনে তোমার কাছে এলাম। দুজনে একসঙ্গে যাওয়াই নিরাপদ। কি বল ?

চোরের কথাবার্তা ও রকমসকম দেখে ব্যবসায়ীর মনে একটু সন্দেহ হলেও সে তার ভাব গোপনই রাখল এবং চোরের কথায় স্বীকৃতও হ'ল।

যথাসময়ে ব্যবসায়ী একটা থলিতে বেশ কিছু বহু মূল্যের হীরামুক্তাদি নিয়ে সে প্রস্তুত হ'ল এবং সেগুলো ভালো করে গুণে দেখে নিল সংখ্যায় তা কত। পরে চোরকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দূর দেশের পথে।

চোর ওর থলিটাকে ভালো করেই লক্ষ্য করতে লাগল, আর তার একমাত্র চিন্তা কতক্ষণে ওগুলো ওর হাতে আসবে।

যাক সারাদিন ওরা চলেছে। চলার পর যখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো, ওরা রাত কাটাবার জন্যে উঠল গিয়ে একটা ধর্মশালায়। সেখানে ওরা অল্পস্বল্প কিছু খাওয়াদাওয়া করে, নিজের নিজের বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।

ব্যাপারী তো শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু চোরের চোখে আর ঘুম আসে না। কেন আসে না, আশা করি তা বুঝতেই পারছ। কি করে ও ঘুমোবে, ওর মন যে পড়ে আছে ঐ মণি-মানিক্যের থলির কাছে। ও কেবল ভাবছে কি করে ওটা হাতড়ানো যাবে। ভাবতে ভাবতে চোর আর শুয়ে থাকতেই পারল না। সে চুপি চুপি উঠল। উঠে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল, ব্যবসায়ী বেশ গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে। চোর ভাবল—না, আর দেরী নয়, এই সুযোগ। এই বেলাই থলি নিয়ে সরে পড়ার অপূর্ব সুযোগ।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। চোর অতি সন্তর্পণে খুঁজতে আরম্ভ করল, কোথায় রেখেছে সেই থলিটা ? কিন্তু কি মুস্কিল, চোর এখানে খোঁজে, ওখানে খোঁজে, কিন্তু থলি আর খুঁজে পায় না। খুঁজতে খুঁজতে চোর একেবারে হয়রান—সে থলি কোথাও নেই। সারারাত খুঁজেও সে তার কোন হদিসই পেল না।

এ দিকে রাত প্রায় ভোর হয়ে আসছে। রাতের অন্ধকার বেশ তরল হ'তে আরম্ভ করেছে। বেচারা চোর নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়ল। হায় রে, তবে কি ওর এত কষ্ট করে এতদূর আসা বিফলই হ'ল !

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। সূর্য উদয় হ'ল। ব্যাবসায়ী উঠে হাত মুখ ধুয়ে আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। চোর আর কি করে, তাকেও উঠে সে সবই করতে হ'ল।

যথাসময়ে ব্যবসায়ী ও চোর যাত্রার জন্যে আবার প্রস্তুত হ'ল। যাত্রার পূর্বে ব্যবসায়ী—তার থলি খুলে, সব মণি-মানিক্যগুলো আবার গুণে দেখে নিল। সব ঠিক আছে। যথাসময়ে তারা আবার বেরিয়ে পড়ল তাদের যাত্রা পথে।

ওরা চলেছে। চোর যেতে যেতে তবু ভাবছে, কি আশ্চর্য ব্যাপার! সমস্ত রাত ধরে কত খুঁজলাম ঐ থলিটা, কোথাও পেলাম না। ওটা কোথায় ছিল?

যাক্ চলতে চলতে আবার এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আবার ওরা উঠল একটা ধর্মশালায়। ঠিক পূর্ব দিনের মত-ই ওরা খাওয়াদাওয়া করে আবার শুয়ে পড়ল। আজকে-ও ব্যাপারী ঘুমোতেই—চোর আবার স্বরু করল তার কাজ। সারারাত ধরে চোর ব্যাপারীর কাপড়-জামা, বিছানা-পত্র, প্রতিটি জিনিষ তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু সে থলি পাওয়া তো দূরের কথা—সে তার চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলো না। শেষ পর্যন্ত ভোর হয়ে আসতে সে পূর্ব দিনের মতই ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়ল।

এই ভাবে আরো দিন কয়েক চলার পর ওরা পৌছে গেল ওদের গন্তব্য স্থানে। চোর নিয়মিত ভাবে তার কাজ করেও সে তার উদ্দেশ্য সাধনের কিছু করতে পারল না। অথচ প্রতিদিন যাত্রা করার আগে ব্যবসায়ী ঠিক তার থলি বার করে, আর রত্নগুলো চোরের সামনে বসেই গোনে। চোর মনের দুঃখে কষ্টে একবারে হতাশ হয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে, চোর একদিন ব্যাপারীকে বলল,—'আরে ভাই, কিছু মনে কোরো না। তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি আমার বন্ধু, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করে আমার তো কোনো লাভ নেই। দেখ আমি ব্যবসায়ী নই। আমি এই ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গ নিয়েছিলাম শুধু তোমার ধনরত্নগুলো নেবার জন্যেই। এবং প্রতিদিন রাত্রি বেলা তা নেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই তা খুঁজে পাইনি। অথচ প্রতিদিন সকাল বেলা তোমার হাতে তা দেখতে পাই। এ কি রহস্য বলো তো?'

চোরের কথা শুনে ব্যবসায়ী তো প্রথমে খুব খানিকটা হেসে নিল। তারপর বলল—'আরে ভাই, তুমিও আমার বন্ধুই তো, তোমার কাছে কোন কথা গোপন করে আমারও কোনো লাভ নেই। আমি প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম যে তুমি আমার ধন-রত্ন গুলো নেবার জন্যেই আমার সঙ্গ নিয়েছ, তবু-ও প্রতি রাত্রে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোই এই জন্যে যে আমি নিশ্চিত রূপেই জানতাম যে তুমি কখন-ই আমার ঐ থলি খুঁজে পাবে না।

আমি কি করি জান? প্রতি রাত্রে আমি আমার ওই থলিটা তোমার বালিসের নীচে রেখে দি। কারণ আমি নিশ্চিন্ত জানি যে ঐ থলি যে তোমারই বালিসের তলায় থাকে, তা তুমি কখনো ধারণায়-ও আনতে পারবে না। কাজেই ওর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর কি হ'তে পারে? বুঝেছ?

মা গল্প শেষ করলেন। পরে বললেন, 'আশা করি এবার তোমরা বুঝেছ। দেখ ঠিক এমনি করে প্রতি মানুষের অন্তরে ভগবান বসে আছেন। অথচ মানুষ তাঁর খোঁজে তীর্থে তীর্থে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ভগবান যে তার অন্তরে-ই তা তো একবার-ও বোঝে না।'

বলতো গল্পটি কেমন লাগলো?

আবার শোনো। অনেকেই এসে মার কাছে বলে,—'মা, আমার মন বড় চঞ্চল! কিছুতে-ই সাধন-ভজনে মনকে বসাতে পারি না! মনকে কি ভাবে একাগ্র করব?'

প্রশ্নটি শুনে মা বলতে আরম্ভ করলেন,—মনকে একাগ্র কি কোরে করে শুনবে? তবে শোন।

সহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে এক জঙ্গলে বাস করতেন, এক মুণি। তাঁর কাছে গুটি কয়েক শিষ্য থাকত এবং তিনি তাদের বেদাধ্যয়ণ করাতেন। প্রতিদিনই তিনি উপদেশ আরম্ভ করবার পূর্বে বলতেন,—'দেখ বৎসগণ, আমার উপদেশ একাগ্রচিত্তে, একমন হয়ে শুনবে। বুঝেছ?'

গুরুর আদেশ। তাই শিষ্যের দল প্রতিদিন খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁর উপদেশ শুনতো।

একদিন গুরু লক্ষ্য করলেন যে তাঁর একটি শিষ্য কেমন যেন পুনঃ পুনঃ অমনোযোগী হয়ে পড়ছে।

বার কয়েক লক্ষ্য করার পর তিনি তাকে ডেকে তার কারণ জানতে চাইলেন,—'সত্যশ্রুতি, কি ব্যাপার বলতো। আজ তোমাকে খুব অমনোযোগী দেখছি কেন?'

শিষ্য গুরুর কাছে মিথ্যা তো বলতে পারে না। বললে তো পাপ হবে। তাই সে অকপটেই গুরুর কাছে সব বলল। সে বলল,—'গুরুদেব, আমায় ক্ষমা করুন। আমার মন আজ আপনার উপদেশের প্রতি অনেক চেষ্টা করেও লাগাতে পারছি না। কারণ সম্প্রতি আমাদের আশ্রমে যে গোবৎসটি জন্ম নিয়েছে, পুনঃ পুনঃ তার কথাই আমার মনে আসছে। কি উপায়ে আপনার উপদেশে মনঃ সংযোগ করি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

শিষ্যের কথা শুনে গুরু কিন্তু তাকে একবারও ভৎসনা করলেন না। মৃদু হেসে বললেন,—'বেশ ব্যাপার যখন এই, তখন তুমি এখন তোমার ঘরে যাও। ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে বসে গোবৎসটির কথাই চিন্তা করো। আমি যখন তোমাকে বাইরে আসতে বলব, তখনই আসবে। তার পূর্বে এসো না। যাও।'

গুরুর আদেশ পেয়ে সত্যশ্রুতি তাই করল।

একদিন অতিবাহিত হ'ল, গুরু জানলা দিয়ে দেখেন, শিষ্য তখনো গোবৎসের চিন্তায় মগ্ন।

বাইরে দাঁড়িয়েই গুরু প্রশ্ন করলেন, 'বৎস! কি করছ?'

শিষ্য উত্তর দিল,—'গুরুদেব, বাছুরটির সঙ্গে মনে মনে ছুটে বেড়াচ্ছি। আমি কি বাইবে আসব?'

গুরু উত্তর দিলেন—'না এখন নয়।'

আবার একদিন গেল। আবার গুরু জিজ্ঞাসা করলেন—'বৎস, এখন তুমি কি করছ?'

শিষ্য উত্তর দিল—'গুরুদেব বাছুরটি আমার কাছে এসেছে, তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আমি কি বাইরে আসব?'

গুরু উত্তর দিলেন,—'না বৎস, এখন নয়।'

আরও এক দিন অতিবাহিত হ'ল। গুরু প্রশ্ন করলেন,—'বৎস, আজ কি করছ?'

গুরুর প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠল।

তখন গুরু বললেন,—'বৎস, এবার তুমি বাইরে এস।'

গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্য আসন ছেড়ে ঘরের দরজার কাছে এল। এসে দরজাটাকে মাথা দিয়ে আঘাত করতে লাগল—ঠিক গরু যেমন তার শিং দিয়ে দরজায় আঘাত করে। গুরু দরজা খুলে দিলেন। দরজা খুলতেই শিষ্য এক লাফে ঘরের বাইরে এসে দুই হাত ও দুই হাঁটু দিয়ে চলতে চলতে ঘাস খাবার উপক্রম করতেই গুরু তাকে দুই হাত দিয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। পরে বললেন,—'ঠিক হয়েছে। আশা করি এবার বুঝেছ মনঃ সংযোগের উপায়।'

আশা করি—তোমরা-ও বুঝেছ। মনকে একাগ্র করতে হলে যার ওপরে একাগ্র করতে, তাকে ভালোবেসে তার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে হবে। ঈশ্বরের চিন্তা করতে হলেও ঐ রূপই করতে হবে। যখন দেখবে তুমি তাঁর সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছ, তখনই বুঝবে ঈশ্বরে তোমার মন একাগ্র হচ্ছে।

এবার শোনো আর একটা গল্প।

একটা পুকুরের তলায় দেখা যাচ্ছে—এক ছড়া সোনার হার পড়ে আছে। পুকুরে নির্মল টলটলে জল তার ভেতর দিয়ে পুকুরের তলায় পড়ে থাকা পাথরের টুকরোগুলো দেখা যাচ্ছে, তারি ভেতরে পড়ে রয়েছে ঐ অপূর্ব সুন্দর হার ছড়া। বহুমূল্য সোনার হার তা পড়ে আছে ওই ভাবে, তা দেখে কারই বা লোভ না হবে? তাই অনেকেই নেমে পড়ল জলে। আরম্ভ হ'ল হারটিকে তুলে আনার প্রচেষ্টা। কত ডোবাডুবি চলল। পুকুরের তলার কত বালু, পাথর ওরা ডুব দিয়ে দিয়ে তুলে আনল। কিন্তু সে হার ছড়া কারোও হাতেই এলো না, অথচ পুকুরের ধারে এসে দাঁড়ালে তা স্পষ্ট দেখা যায়। কি যে ব্যাপার! অনেক পরিশ্রম করে অনেক হয়রান হয়েও যখন তা পাওয়া গেল না লোকগুলো নিরাশ হয়ে ভাবছে, এ কি রহস্য?

এরই মধ্যে হঠাৎ একজনের চোখে পড়ল পুকুরের ধারে একটা বেল গাছের ওপরে। সে ওপরের দিকে তাকাতেই দেখে ঐ গাছটার মগডালেও ঝুলছে এক ছড়া ঐ রকম সোনার হার। তখন সকলে তা লক্ষ্য করে তাদের আর বুঝতে দেরী হ'ল না যে হার ছড়া আসলে রয়েছে ঐ মগডালেই ঝুলে, আর তারি ছায়া ঝলমল করছে ঐ পুকুরের জলে। আসলে ওখানে কোন সোনার হার নেই। ঝোলানো গাছের ডালে সোনার হারের ছায়া মাত্র পড়ে আছে পুকুরের তলায়।

এই বলে-ই মা চুপ করলেন। সবাই মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, এ আবার কি গল্প!

মা তখন বললেন,—বুঝলে না? মানুষ সুখ পেতে চায় সুখী হ'তে চায় এবং তারা মনে করে টাকা-পয়সা, খেলা-ধূলা, খাওয়া-দাওয়া এ সবের মধ্যে-ই বুঝি সুখ। তাই তারা আজীবন তার পিছনেই ছোটাছুটি করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় একমাত্র ভগবানের কাছে। আর আমরা যে খেলা-ধূলা গৃহ-সংসারে সুখ খুঁজে ফিরি, সে হ'ল ঐ পুকুরের তলায় হার খোঁজার মতই। সে সুখ কখনো পাওয়া যায় না। কারণ যেখানে সুখ আছে বলে আমরা মনে করি, সে সুখ মিথ্যা। সে সুখ প্রকৃত সুখের ছায়া মাত্র।

আচ্ছা তা না হয় বুঝলাম যে সুখ ভগবানের কাছে আছে। কিন্তু তা পেতে হলে আমাদের তো জানা দরকার, ভগবানের পরিচয়—অর্থাৎ তিনি কোথায় থাকেন, কি খান, কি করেন ইত্যাদি।

তোমাদের কারো এসব খবর জানা আছে নাকি? যদি না থাকে, তবে শোনো মা তার উত্তর দিচ্ছেন।

এক ছিল রাজা। রাজা বলে রাজা, একেবারে মহারাজা।

একদিন তিনি তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন আর তাঁর সামনে উপস্থিত তাঁর মন্ত্রী, উজির, নাজির, সভাসদ্ প্রভৃতি।

হঠাৎ রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, মন্ত্রী আমার চারটে প্রশ্ন মনে জেগেছে, আমি তার উত্তর চাই। কাকে জিজ্ঞাসা করলে তার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে বলতে পারো। কাল সারা রাত ভেবেও আমি তার উত্তর খুঁজে পাইনি, তার উত্তর আমার চাই-ই।

মন্ত্রী তো রাজার সামনেই বসে। রাজার কথা শেষ না হ'তেই তিনি হাত জোড় করে বললেন,—'হুজুর, প্রশ্নের উত্তর তো, প্রশ্ন শুনলে তবেই বলা যাবে। তা হুজুরের প্রশ্ন ক'টি কি, জানতে পারি?'

মন্ত্রীর কথায় রাজা বললেন,—'নিশ্চয়ই। অতি সহজ সরল প্রশ্ন। কিন্তু তার উত্তরগুলো যে কি? যাক্ শোনো প্রশ্ন চারটি হচ্ছে—সবাই তো ভগবান ভগবান করে, কিন্তু ভগবান থাকেন কোথায়? আর তিনি কি খান? আর তিনি কখন হাসেন এবং শেষ প্রশ্ন তাঁর কাজটা কি? এই তিন প্রশ্নের উত্তর আমার

চাই এবং যার কাছ থেকে এগুলোর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে তাকে দেব অজস্র পুরস্কার।

মন্ত্রী রাজার কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে একটু মুচকি হাসলেন এবং সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা সবাই তো মহারাজের প্রশ্ন কটি শুনলেন। অতি সময়োচিত ও রাজযোগ্য প্রশ্ন নিঃসন্দেহে। আপনাদের কারো কি প্রশ্ন কটির উত্তর জানা আছে? থাকলে যার জানা আছে তিনি এগিয়ে আসুন এবং উত্তর বলে দিয়ে পুরস্কারের অধিকারী হোন।'

সভাসদগণও রাজার প্রশ্ন শুনে সবাই একটু হেসেছিলেন। এবার মন্ত্রীর কথা শুনে, সবাই প্রায় সমস্বরেই বলে উঠলেন, 'অতি সহজ, অতি সরল তবে রাজযোগ্য প্রশ্ন বটে।' একথা বলে প্রায় সমস্বরে সবাই বলতে আরম্ভ করে দিলেন,—'দেখুন, সকলেই জানে ভগবান স্বর্গের বাসিন্দা, আর তিনি ভক্তদের প্রদত্ত দধি, দুগ্ধ, মিঠাইমণ্ডা প্রভৃতি অতি উপাদেয় বস্তুই আহার করে থাকেন। আর তিনি কখন হাসেন? তা মানুষ যেমন আনন্দের মুহূর্তগুলিতে হেসে ওঠেন, তিনিও তখনই হাসেন? আর তাঁর কাজের কথাও প্রায় সকলেরই জানা। তাঁকে তো বলাই হয় সৃষ্টিকর্তা। গাছপালা, মানুষ, জীব অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণী তৈরী করাই তাঁর কাজ। এতে আর বলার কি আছে!'

সবাই এমন গোগ্রাসে কথাগুলো বলল, মনে হ'ল যেন যার কথা আগে শেষ হবে, সেই হবে পুরস্কারের অধিকারী।

যাক্, মন্ত্রী তাঁদের বক্তব্য রাজার কাছে পেশ করলেন।

রাজা কিন্তু উত্তরগুলো শুনে একটুও খুশী হলেন বলে মনে হ'ল না। তিনি বললেন,—'দেখুন, ভগবান স্বর্গে থাকেন যদি বলেন, তবে স্বর্গটা কোথায়? আর স্বর্গ বলে যদি কোথাও কিছু থাকে এবং তিনি সেখানে থাকেন, তার প্রমাণাদি বা কি? আর তিনি দধি দুগ্ধ মণ্ডা মিঠাই খান একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়—কারণ আমি দেখেছি যে পূজার সময় তাঁর সামনে ঐ সব দ্রব্যাদি যখন দেওয়া হয়, তা যেমন তেমনই পড়ে থাকে, খাওয়া তো দূরের কথা তিনি তা স্পর্শ করেন বলেও মনে হয় না। তাঁকে হাসতে কি আপনারা কখনো দেখেছেন? মানুষের মত সুখ-দুঃখে তিনি বিচলিত হ'তে পারেন না কখনো, তিনি যে ভগবান। আর তিনিই যে সব সৃষ্টি করে চলেছেন তাও ঠিক নয়। কারণ সৃষ্টিকর্তা হলেন ব্রহ্মা।'

সভাসদরা দেখলেন তাঁদের মোটা পুরস্কারটা বুঝি হাত ছাড় হয়েই যায়। তাই তাঁরা রাজার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ বাক্-বিতণ্ডা করলেন। কিন্তু মহারাজ তাঁদের সে সব কথা উপযুক্ত যুক্তি বা প্রমাণের অভাবে কিছুতেই মানতে রাজী হলেন না। সভাসদগণ পরাস্ত হয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। মন্ত্রী ভাবতে লাগলেন তবে উপায়।

এদিকে রাজা মন্ত্রীকে বললেন,—'মন্ত্রী, আমার প্রশ্নের উত্তরের ব্যবস্থা কর।'

অনেক ভেবেচিন্তে মন্ত্রী বললেন,—'হুজুর, এ সব প্রশ্ন রাজকীয়, তাই অত্যন্ত গূঢ়। এর উত্তর কেউ দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবে যদি পারেন দিগ্‌গজ পণ্ডিতরাই পারবেন। তাই আমার নিবেদন,—'হুজুরের আশ্রয়ে, হুজুরের রাজ্যে বাস করেন বহু দিগ্‌গজ পণ্ডিত। তাঁদের একটা সভা আহ্বান করা হোক এবং মনে হয় সেই সভাতেই এসব বিদগ্ধ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।'

রাজার মনে কথাটা খুব ধরল। সুতরাং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ দিলেন, —'ঠিক মন্ত্রী ঠিক, এই হ'ল যুক্তিযুক্ত কথা। আমার আশ্রয়ে বাস করা দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের অভাব নেই অতি সত্য কথা। তাঁদেরই কাছে পাওয়া যাবে এসব প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর। বেশ মন্ত্রী তুমি রাজ্যে ঢেড়া পিটিয়ে দাও।'

রাজার হুকুম। সঙ্গে সঙ্গেই ঢেড়া পিটিয়ে দেওয়া হ'ল। ঢেড়া শুনে বহু পণ্ডিত রাজসভায় উপস্থিত হতে লাগলেন। কিন্তু কারো উত্তরই রাজার মনোমত না হওয়ায় সেই অজস্র পুরস্কার পণ্ডিতদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল।

দিনের পর দিন যায়। পণ্ডিতদের আনাগোনায় আর বিরাম নেই। পুরস্কারের লোভে সবাই আসে। কিন্তু হতাশ হয়ে সবাই ফিরে যায়।

এখন সেই রাজ্যে ছিল এক চাষা। সে তার মাঠে চাষআবাদ করে, আর দেখে প্রতিদিন রাজবাড়ীতে বহু লোক যায় আর আসে। সে বুঝতে পারে না কি ব্যাপার!

কয়েকদিন এইভাবে দেখার পর, একদিন তার মাঠের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একটি লোককে সে জিজ্ঞাসা করল,—'বলুন তো রাজবাড়ীতে কিসের উৎসব—নিত্য এত লোকের যাওয়া-আসা—কোন সৎসঙ্গাদি হচ্ছে কি?

চাষা সৎসঙ্গের ব্যাপারে খুব আগ্রহী। সে সুযোগ পেলেই সৎসঙ্গ করে থাকে। লোকটি বলল, 'ও তুমি শোনো নি বুঝি চাষী ভায়া। রাজার চারটি প্রশ্ন আছে। যে সে প্রশ্নকটির উত্তর দিতে পারবে সে পাবে অজস্র পুরস্কার। তাই এত পণ্ডিতদের রাজবাড়ীতে যাওয়া-আসা।

চাষার কৌতূহল বাড়ে। সে জানতে চায়—'বলুন তো কি সেই সব প্রশ্ন?'

লোকটি বিস্তারিত ভাবেই তাকে জানায়—'প্রশ্ন কটি হ'ল—ভগবান কোথায় থাকেন? কখন হাসেন? কি খান। আর তিনি কি করেন।'

প্রশ্নগুলো শুনে চাষীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আগেই বলেছি যে চাষা খুব সৎসঙ্গ প্রেমিক। সে বহু সৎসঙ্গে বহুবার যোগদান করেছে—সাধু-মহাত্মাদের কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর সে বহুবার শুনেছে। কাজেই সবই তার জানা।

তাই সে লোকটির কথা শুনে বলল,—'ও এই কথা। এর জন্যে এতদিন ধরে এত লোকের যাওয়া আসা। এসব তো অতি সাধারণ কথা।'

চাষার কথা শুনে লোকটি আর এক পাও এগুলো না। সেখান থেকে সোজা সে ফিরে গেল রাজবাড়ীতে। মন্ত্রী মশায়ের কাছে বিস্তারিত ভাবে চাষার সব কথা জানাল।

মন্ত্রী মশাই ইতিমধ্যেই প্রায় পাগল হয়ে উঠেছেন। তিনি বিরক্ত হয়ে প্রায়ই ভাবেন, রাজার এ পাগলামি আর কত দিন চলবে। দিন নেই রাত নেই লোকজনের এ আসা-যাওয়া আর তো পারি না। তাই চাষার কথা শুনে তিনি ভাবলেন—দেখাই যাক চাষাকে ডেকে, যদি রাজার এ পাগলামির একটা কূল-কিনারা পাওয়া যায়।

পরদিনই মন্ত্রীর আহ্বানে চাষী এসে উপস্থিত। মন্ত্রী রাজাকে চাষার কথা বলে, চাষাকে রাজার সামনে পেশ করতেই রাজা বললেন,—'কি হে পারবে নাকি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে?'

রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রথমতঃ চাষীর একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু রাজার প্রশ্ন তো তার জানাই আছে। তাই সাহস সঞ্চয় করে সে বলল,—'আজ্ঞে তা বোধ হয় পারব।'

রাজা বললেন, 'বেশ তবে শোন আমার চারটি প্রশ্ন : ১। ভগবান কোথায় থাকেন? ২। তিনি কি খান? ৩। তিনি কখন হাসেন? আর ৪। তিনি কি করেন?

রাজার প্রশ্নগুলো শুনে প্রথমে চাষী যেন কি একটু ভেবে নিল। পরে বলল,—'হুজুর, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব ঠিকই, কিন্তু তা বলার আগে আমার একটি কথা আছে।'

রাজা বললেন,—'বেশ। তোমার কি বলার আছে, বল।'

চাষী বলল,—'হুজুর, রাজ দরবারে আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আমি যা বলব, তা আপনাকে মেনে নিতে হবে। এবং তা হলেই আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে।'

রাজা স্বীকৃতি জানালে, চাষী বলতে আরম্ভ করল,—'হুজুর, আপনার প্রথম প্রশ্ন ভগবান কোথায় আছেন? ভগবান কোথায় নেই? তিনি যে সর্বত্র বিরাজিত। আপনি কি তার প্রমাণ শাস্ত্রে পান নি? শাস্ত্রে আছে, ঈশা বাস্যম্ ইদম্ সর্বম্! তিনি যে সর্বত্র আছেন এ হ'ল তার প্রমাণ।'

পূর্বেই বলেছি—চাষী বহু সাধু-মহাত্মাদের সৎসঙ্গ করে—এসব সে শিখে নিয়েছিল।

শাস্ত্রের প্রমাণ নিয়ে রাজা তার কথাটা মানতে বাধ্য হলেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—'বেশ তা মানলাম, কিন্তু তিনি কি খান?'

চাষা বলল,—'ভগবান খান ভক্তের অহংকার।'

রাজা তো এবার উত্তর শুনে চমকেই উঠলেন, চোখ দুটো বড় বড় করে বলে উঠলেন,—'এ্যা' অহংকার আবার খাবার বস্তু নাকি? আর তার প্রমাণ?'

চাষা—হুজুর, জানেনই অহংকার মানুষের পতন ঘটায়। যতক্ষণ মানুষ ভগবানকে ভক্তি না করে, ততক্ষণ সে মনে করে আমিই সর্ব বিষয়ে কর্তা। আমিই সব জানি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যে মুহূর্তে মানুষের ভগবানের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস আসে, সে মুহূর্ত থেকেই সে আর 'আমি করি, আমি জানি' এ জাতীয় কথা বলে না বলে ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হয়। বলুন, হুজুর, এ কথা কি সত্য নয়?'

রাজা স্বীকার করলেন, বললেন,—'হ্যাঁ জ্ঞানী-জন তো তাই বলে থাকে।'

চাষী—'ঐ সাধু মহাত্মারাই তো ভগবানের ভক্ত, তাঁরা তা বুঝতে পারেন বলেই তা বিশ্বাস করেন। তবে, কোথায় গেল তাঁদের অহংকার। তাঁদের অহংকার ভগবান খেয়ে ফেলেছেন।'

রাজা ভেবে দেখলেন কথাটা ঠিকই।

চাষী—'তারপর ভগবান কখন হাসেন ? হুজুর তার উত্তর শুনুন।

এ জগতে সব চাইতে মজার ব্যাপার হল এই যে, পৃথিবীতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক জন্মায় এবং মরে। তাদের মধ্যে কেউ তো চিরকাল বেঁচে থাকে নি, অথচ চোখের সামনে প্রতিদিন এ ব্যাপার দেখেও, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা এমন ভাবে কথাবার্তা বলেন ও কাজ-কর্ম করেন যে তা দেখে মনে হয় যে তাঁরা বুঝি চিরকাল অমর হয়েই থাকবেন, কোনো দিনও মরবেন না।

ভগবান যখন তাঁদের এই মনভাব ও কাজকর্ম দেখেন, তখন তিনি হাসেন। বলুন হুজুর এটা কি হাসবার কথা নয় ?'

রাজা চাষীর এ কথাও অস্বীকার করতে পারলেন না। সুতরাং কথাটা তাঁকে মেনে নিতেই হ'ল।

রাজা চাষীর কথা বলার ঢং ও তার যুক্তিপূর্ণ কথাবর্তাগুলো শুনে মনে মনে প্রসন্নই হচ্ছিলেন। এবং এই কারণেই চাষীর প্রতি তাঁর একটা শ্রদ্ধার ভাবও জেগে উঠছিল।

এবার রাজা তাঁর চতুর্থ প্রশ্ন চাষীকে বলতেই চাষী বললে,—'হুজুরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে—প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করার পূর্বেই, আমি নিবেদন করেছিলাম যে, আমি যা বলব তা আপনাকে মেনে নিতে হবে, তবেই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে। এবং আপনি তাতে স্বীকৃতিও জানিয়েছিলেন। আশা করি তা আপনার স্মরণে আছে।'

রাজা পুনরায় সে কথা সমর্থন করতেই, চাষী করজোড়ে রাজাকে বললেন,—'হুজুর আপনাকে একটু অনুগ্রহ করে আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে। রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে চাষীর পাশে এসে দাঁড়াতেই, চাষী একেবারে রাজার সিংহাসনে গিশে বসে পড়ল। এবং ঠিক রাজোচিত ভাবেই সভাস্থ সকলের দিয়ে তাকাতে লাগল।

চাষীর কাণ্ড দেখে রাজা তো হতভম্ব। একি ব্যাপার ? রাজার মুখে অসন্তুষ্টির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু তিনি কিছুই বলতে পারছেন না এই জন্যে যে চাষী তো প্রথমেই রাজাকে সর্তবদ্ধ করে নিয়েছিল যে সে যা বলবে, তা রাজাকে শুনতে হবে।

নিরুপায় রাজা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটু রাগতস্বরেই বললেন,—'কি হে ? বলছ না যে ভগবান কি করেন ?'

এবার চাষী সিংহাসন থেকে নেমে এসে রাজাকে সিহাসনে বসতে বলল এবং নিজে আবার হাত জোড় করে সেইভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজার মনে হ'ল চাষী বুঝি আর উত্তর দিতে না পেরে করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে। তাই একটু রুষ্ট হয়েই তিনি বললেন,—'কৈ চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছ না বুঝি ?'

চাষী কিন্তু হাত জোড় করেই বলল,—'সে কি মহারাজ দিলাম যে।'

রাজা এবার ক্রোধের স্বরেই বললেন,—'কি মিথ্যে কথা ! কি উত্তর দিলে ? আবার বল।'

চাষী কিন্তু একটুও ভয় পেলো না। নরম স্বরে বলল,—'হুজুর দিলাম না ? দেখলেন না ভগবান রাজাকে প্রজা, আর প্রজাকে রাজা করেন। এই তো এক্ষুণি আমি রাজসিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছিলাম, আপনি ছিলেন প্রজার জায়গায়। আবার পর মুহূর্তেই দেখুন আমি প্রজা, আপনি রাজা।'

মহারাজ কথাটা বুঝতে পেরেই বললেন, 'তাইতো, তাইতো, বুঝেছি বুঝেছি। মন্ত্রী একে পুরস্কারটা দিয়ে দাও।'

কেমন ? পেলে তো ভগবানের সব খবর।

আচ্ছা, গল্প তো শুনলে। মায়ের গল্পের থলির চেয়ে, তাঁর চিঠিপত্রের থলি কিন্তু অনেক বেশী বড়। তাই এবার শোনাচ্ছি মায়ের চিঠিপত্রের থলির কিছু কাহিনী।

চিঠিপত্র মায়ের কাছে প্রতিদিন আসে অনেক। গুণে দেখা গেছে প্রতিদিন আসা চিঠির সংখ্যা প্রায় ১৫০ থেকে ২০০-র মধ্যে। আবার কখনো কখনো অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এ সংখ্যাও অতিক্রান্ত হয়ে যেতো। এত যে সব চিঠি, তা লিখতেন কারা ? যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে সর্ব জাতীয় লোক আছেন। তাদের মধ্যে আছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, অল্প বয়সের ছেলে-মেয়ে, অল্প বয়স্ক শিশু, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, স্বধর্মী বিধর্মী সব। আর সে সব চিঠি আসত পৃথিবীর সর্বত্র থেকে, এক কথায় দেশ-বিদেশ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বত্র হতে।

আচ্ছা, এত যে চিঠিপত্র আসত, তাতে ওরা কি লিখত ?—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুস্কিল, তার চেয়ে চিঠিপত্রে কি বিষয়ে তারা লিখত না, তা বলা সহজ। কারণ সংক্ষেপে বলতে পারা যেতে পারে যে পৃথিবীতে মানুষের সুখ-দুঃখ,

বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যু, আধ্যাত্মিক, জাগতিক, পারিবারিক—এক কথায় হেন কোন বিষয় নেই যা সেই সব চিঠিতে না থাকত। অর্থাৎ মানুষের জীবনে এমন কোনো বিষয়ই হতে পারে না, যা তাতে থাকত না।

বড়রা তাদের মনের সব কথা খুলে মাকে জানিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করত,—মা আমাদের এই সমস্যা তুমি ছাড়া এসব সমস্যার সমাধান আর কে করবে ?

মেঝো বয়েসীরাও তাদের মন তুলে ধরত মায়ের কাছে তাদের চিঠির মাধ্যমে। তার পর জিজ্ঞাসা করত, 'মা, আমার এই আশা, এই আকাঙ্ক্ষা, এই চাই, ওই চাই, তুমি তার বন্দোবস্ত করে দাও।'

আবার কিশোর-কিশোরী অর্থাৎ তোমাদের বয়েসী যারা চিঠিতে তাদের বক্তব্য হতো,—'মা আমার পরীক্ষা আরম্ভ হবে, আশীর্বাদ করো কিন্তু যেন পাশ হয়ে যাই।' 'মা, আমার মা আমাকে বেশী ভালবাসে না, ছোট ভাইকে বেশী ভালবাসে, তুমি মাকে লিখে দিও আমাকেভ ভালবাসতে।' আবার কেউ কেউ লিখত,—'জয় মা, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে, অনেকদিন দেখি না। তুমি এদিকে আসছ না কেন ? অর্থাৎ সে সব চিঠিতে থাকত—আদর, আবদার, মান, অভিমান প্রভৃতি যাবতীয় কথাই।

আবার আরেক ধরণের চিঠি আসত মায়ের কাছে, তাতে ফুটে উঠত মায়ের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি, আন্তরিক প্রীতির অভিব্যক্তি।

যাক্, পত্র তো আসত। পত্র এলেই সেগুলোকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করে ফেলা হ'ত। তাদেদ নামকরণ এইভাবে করা যেতে পারে :

১। আধ্যাত্মিক, ২। বৈষয়িক, ৩। পারিবারিক ও ৪। শিশুলিখিত পত্র।

চিঠিগুলো ভাগ করা হয়ে গেলে প্রতিটি চিঠি উপস্থিত করা হ'ত মায়ের নিকট—মায়ের খাওয়া বা শোওয়ার সময়ে। কারণ ঐ দুটি সময়ই, তা যত অল্প ই হোক না কেন, ছিল মায়ের চিঠি শোনার সময়। কারণ, মাকে ঐ দুটি সময় ছাড়া অন্য সময়ে এত ব্যস্ত থাকতে হ'ত যে সেখান থেকে সময় বার করা ছিল অসম্ভব। অবশ্যি মা যখন গাড়ীতে, রেলে বা মোটরের যাত্রায় থাকতেন, তখন অবশ্যি মা বলতেন, 'এখন তো অখণ্ড অবসর, এখন সব চিঠি পড়।'

যাক্ মা সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর ব্যস্ততা হ'ল সাধু মহাত্মাদের নিয়ে, তা ছাড়া ছিল ভক্তদের সৎসঙ্গ দেওয়া। আবার আশ্রমের শত সহস্র কাজের

পেছনেও তো মায়েরই প্রেরণা। মা ছিলেন পূর্ণ। তাই তাঁর প্রতিটি কার্যকে হতে হবে পূর্ণাঙ্গীন। অর্থাৎ আমরা তো মানুষ, আমাদের কাজ করতে গেলেই প্রতি কাজে, প্রতি পদে শত সহস্র ভুলত্রুটি, অপূর্ণতা আর অসঙ্গতি আসেই, কিন্তু মায়ের কাছে তা হলে চলবে না। তাঁর নির্দেশে করা প্রতিটি কাজ হবে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গীন পূর্ণ। এই কারণেই আমাদের প্রতিটি কাজে প্রয়োজন হ'ত মায়ের উপদেশ, মায়ের নির্দেশ, কর্মধারা ও পদ্ধতির পথ প্রদর্শন।

যেমন ধর, হয়ত কোনো মহাত্মা আসছেন। মার কাছে সে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই মা সে বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ মা তো অন্তর্যামী, তিনি জানেন প্রতিটি লোকের সংস্কার। তিনি জানেন কি তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, আর কিই বা তাদের পছন্দ অপছন্দ। সুতরাং কারো আসার সংবাদ পেয়েই মা সকলকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। কোথায় তিনি বসবেন, কি ভাবে তাঁর আদর অভ্যর্থনা করতে হবে, তিনি কি খেতে পছন্দ করবেন, সব একাধারে খুঁটিনাটি করে মা বলবেন এবং যথাযথ ভাবে তা হলেই তবে মায়ের ছুটি। মা কি বলতেন জানো? মা বলতেন,—'মায়ের কাছে সন্তান—সে তো তার পরম ও চরম। আসলে দুই তো নাই, সবই তো একের প্রকাশ।' আর এই সত্যটাই মায়ের এই সব ক্রিয়া কলাপে দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

একবার এক বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মচারী আসবেন মায়ের দর্শনে। সে সংবাদ পেয়ে মা যথারীতি তাঁর আদর সংকারের সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন। যথাসময়ে ব্রহ্মচারিজী এলেন। তিনি আসতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'ল মায়ের কাছে।

কত সাধু মহাত্মাই তো দিনেরাত্রে সদাসর্বদা মার কাছে আসেন। মা তাঁদের বসার জন্য সুন্দর আসন, গদি, ঠেস তাকিয়া বিছিয়ে সাজিয়ে রাখতে বলেন। কিন্তু এই ব্রহ্মচারীজীর আসার সংবাদে মা কিন্তু সে রকম করলেন না। মা বললেন যে একখানা আরাম-কেদারার ওপরে সুন্দরভাবে একখানা আসন বিছিয়ে রাখতে। আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা আসবেন তাঁদের জন্য বিছিয়ে রাখতে বললেন তিনখানা আসন।

যাক্ যথাসময়ে ব্রহ্মচারিজী মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন, দেখলেন আসন পাতা রয়েছে। তা দেখেই তিনি বললেন,—'মা নীচু আসনে বসতে পারি না, পায়ের এমন দুরাবস্থা।'

সঙ্গে সঙ্গেই মা অদূরে রক্ষিত সেই সজ্জিত আরাম কেদারাখানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন,—'বাবা, বাবা গো, এ আসন তোমার নয়, ঐ তো তোমার আসন। ওখানে তুমি বস বাবা। তুমি তোমার মেয়ের কাছে আসছ খবর পেয়েই, তোমার ছোট মেয়ে ঐ আসন পাতিয়ে রেখেছে। আর এই আসনগুলোতে ওরা বসতে পারবে বাবা।'

ব্রহ্মচারিজী বসলেন আরাম কেদারায় আর তাঁর ভক্তরা বসলেন আসন গুলোতে। আশ্চর্য ব্যাপার, মেঝেতে মা তিনখানা আসন বিছিয়ে রাখতে বলেছিলেন, ওঁর সঙ্গে তাঁর ভক্ত ঠিক তিন জনই এসেছে।

ব্রহ্মচারিজীর মায়ের এই সব কথা শুনে আর তাঁর কার্যকলাপ দেখে কেমন যেন ভাবান্তর ঘটল। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন,—'অন্তর্যামী মা আমার তোর যে করুণার পার নেই। তোর নাম আর স্নেহের কথা শুনেছিলাম, আর আজ এই দুটো চোখ দিয়ে তা প্রত্যক্ষ করলাম। মাগো, তোর যে বিশ্বতঃ দৃষ্টি।'

বলতে বলতে তাঁর দুটি চোখ অশ্রু সজল ও কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

যাক্ এই ভাবেই প্রতিটি কাজে থাকত মায়ের কর্মব্যস্ততা, নৈলে কি, মার কাছে নিত্য এই যে অগণিত জনস্রোত বয়ে আসত, তাদের প্রতিটি লোকের মন রক্ষা করা অপূর্ণ মানুষের কাজ। একমাত্র অন্তর্যামী মায়ের কাছেই তা সম্ভব।

আর একথা তোমাদের পূর্বে-ও বলেছি যে মায়ের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁদের প্রতিটি লোকের-ই মাকে দর্শন ও মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা ক'রে ফিরে যাবার সময় মনে হত, 'মা আমাকেই সব চাইতে বেশী স্নেহ করেন।' অনেকেই কথা প্রসঙ্গে তা বলে ফেলতেন।

এ ব্যাপারটা কত আশ্চর্য জনক, ভেবে দেখ তো।

যাক্ সে কথা। চিঠিগুলোকে মার কাছে নিয়ে গেলে মা কখনো শুয়ে, কখনো বা বসে বলতেন,—'চিঠিগুলো পড়।'

এক এক খানা করে প্রতিটি চিঠি মাকে পুরোপুরি পড়ে শোনান হ'ত। মা-ও প্রতিখানি চিঠির উত্তর লেখাতেন। সে সব উত্তরে থাকত, পত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর, প্রতিটি সমস্যার সহজ সমাধান। আর স্নেহভালবাসা দিয়ে মুড়ে দেওয়া সান্ত্বনার প্রলেপ।

আর তোমাদের মত ছোটদের কাছ থেকে যে সব পত্র মার কাছে আসত মা সে গুলো খুব ভালো করে শুনতে চাইতেন। বলতেন,—'বন্ধু কি লিখেছে, আবার পড় তো!' বার কয়েক সে চিঠিগুলো শুনে বলতেন,—'আচ্ছা বন্ধুকে লেখো,—বলে তোমাদের বুঝতে-পারা-ভাষায় লেখাতেন তার উত্তর। সে গুলো কি রকম, শোনো তার কিছু নমুনা।

ন' বছরের একটি মেয়ে মাকে লিখেছে,—'জয় মা, তুমি কেন আমাদের কাছে আসছ না। আমার বুঝি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে না?'

মা তার উত্তর লেখালেন,—'বন্ধু, আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি! আমি তো সব সময়ই তোমার কাছে আছি। তুমি ঠাকুরকে খুব ভালো করে বোলো তবেই তিনি তোমাকে দেখিয়ে দেবেন।'

পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এগার বছরের ছেলে নীতীশ লিখেছে,—'মা, আমার পরীক্ষা শীগ্‌গীরই আরম্ভ হবে। আমার কিন্তু খুব ভয় করছে মা।'

মা—'ভয় কিসের? ভালো পড়লেই তো ভালো পাশ। মা বাবা যেমন বলেন, তেমনি করে পড়বে। মা বাবাকে প্রণাম করে, ঠাকুরকে প্রণাম করে পরীক্ষা দিতে যাবে। ভয় আবার কি?'

আট বছরের মেয়ে সবিতা, তার মার নামে অভিযোগ করেছে,—'জয় মা, মা বলেছে যে আমি দুষ্টুমি করলে তুমি দেখতে পাবে। তখন তুমি আর আমাকে তোমার কাছে যেতে দেবে না। আমি দুষ্টুমি করলে কি তুমি দেখতে পাবে?'

মার উত্তর,—'দুষ্টুমি করলে তো সকলেই দেখতে পাবে। মা, বাবা, ভাই, বোন সক্কলে। দুষ্টুমি কি করতে হয়? মা বাবার কথা শুনতে হয়। বুঝেছ?'

আর একটি ছেলে লিখেছে,—'মা', মা বলেন কিছু খাবার আগে ভগবানকে দিয়ে খেতে হয়। তুমি তো ভগবান, তোমাকে কি করে দেব?'

মা—হ্যা, তোমার মা ঠিক বলেছেন। কিন্তু খাবার আগে ভগবানকে তো দিতেই হয়। তুমি কিছু খাবার আগে মনে মনে ভগবানকে চিন্তা করে, নমস্কার করে তাঁর প্রসাদ নিও। তবেই তিনি খেয়ে নেবেন।'

একবার একটি ছেলে মাকে চিঠি দিয়েছে,—'জয় মা, রাম বড় না কৃষ্ণ বড়? রাম বড় না?' শংকর বলে কৃষ্ণ বড়। (শংকর ছেলেটির বন্ধুর নাম) 'তুমি বলো আসলে কে বড়?'

মা উত্তর লেখালেন,—'আসলে কে বড়? আসলে দুজনই বড়। দেখো না, কখনো তোমার বন্ধু তোমার কথা শোনে, আবার কখনো তুমি তোমার বন্ধুর কথা শোনো। এ জন্যে তোমরা দুজনেই বড়। তেমনি রামও বড়, কৃষ্ণও বড়। আবার তোমরা দুজনে যেমন এক সঙ্গে খেলা কর, মিলেমিশে লেখাপড়া কর, তেমনি রাম ও কৃষ্ণ এক। তেমনি তোমরা যখন এক সঙ্গে খেলা কর, তখন তোমরা দুজনেই সমান হলে তো?'

একটি ছেলে মাকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে,—'মা, ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায় না কেন?'

মা বললেন,—'বন্ধুকে লেখো,—কে বলল ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায় না। তুমি যেমন তোমার মা, বাবাকে ডাকলে তাঁরা তোমার কাছে আসেন, ঠিক তেমনি, ভগবানকে ডাকলে ভগবান-ও আসেন, তিনি এলে তখন তাঁকে দেখাও যায়।'

একবার মা সৎসঙ্গে বসে গাইছেন, 'হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ।' ঐ সৎসঙ্গে একটি ১১।১২ বছরের ছেলেও বসেছিল। সৎসঙ্গের শেষে ছেলেটি মাকে জিজ্ঞাসা করল,—'মা, হরি নারায়ণ তো ভগবান।'

মা—'হ্যা, এটি ভগবানের বিপদভঞ্জন কথা।'

ছেলে—'বিপদ-ভঞ্জন কি?'

মা—'যখনই তোবার কোন ভয় বা কষ্ট আসবে, তখনই এ নাম করবে। তাতে তোমার দুঃখ দূর হয়ে যাবে। ভগবানকে এ নামে ডাকলে সব বিপদ-আপদ দূর হয়ে যায়। সেজন্য ভগবানের এক নাম বিপদ-ভঞ্জন হরি—নারায়ণ।'

সেই থেকে ছেলেটি যখনই মাকে চিঠি লেখে, সে মাকে 'বিপদভঞ্জন' বলে সম্বোধন করে।

আর একটি মেয়ে মাকে লিখেছিল,—'মা কি করলে আমি ভালো মেয়ে হয়ে যাবো!'

মা উত্তর লেখালেন,—'তুমি একটা কাজ কোরো। তুমি রোজ ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে, ভগবানের যে নাম তোমার ভালো লাগে তা ২৫ বার করে একটা খাতায় লিখবে। তারপর সকাল সন্ধ্যা দুবেলা সে খাতাখানাকে নমস্কার করবে। খাতা শেষ হয়ে গেলে আবার একখানা নতুন খাতা করবে, আর

পুরানো খাতাখানা নমস্কার করে নদীতে ফেলে দেবে। এই ভাবে রোজ ঠিক ঠিক করলে খুব ভালো মেয়ে হতে পারা যায়। মনে থাকবে তো?'

একটি অল্প বয়স্ক ছেলে খুব অসুস্থ। তার মা, মায়ের কাছে দুঃখ করে লিখেছেন যে তার ছেলের খুব জ্বর বেশ কিছু দিন ধরে চলছে। ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, কিন্তু ছেলে কিছুতেই ওষুধ খেতে চায় না।

মা সেই চিঠির উত্তরের সঙ্গে ছোট ছেলেটিকেও একটি চিঠি লেখালেন। মা লেখালেন—'বন্ধু, তুমি কেমন আছ? তুমি বুঝি জানো না জ্বর হ'লে ওষুধ খেতে হয়! মাকে রোজ বলবে,—'মা আমাকে ওষুধ খেতে দাও। রোজ চেয়ে চেয়ে ওষুধ খাবে। তবেই দেখবে খুব তাড়াতাড়ি তুমি ভালো হয়ে যাবে। তখন মা ও বাবাকে নিয়ে গট্ গট্ করে এখানে বেড়াতে চলে আসবে।'

একটি শিশু, সবে তার হাতে খড়ি হয়েছে। সে-ও মাকে এক চিঠি লিখে বসেছে। তার চিঠিতে আছে শুধু তিনটি আঁকা-বাঁকা অক্ষর। 'খ' 'ক' 'অ'। অক্ষর তিনটি যে সে তার মা, বা বাবার হাত ধরেই লিখেছে তা নিঃসন্দেহ। তার মা বাবাই যে ছেলেকে দিয়ে ওই চিঠি লিখিয়ে তার লেখাপড়া জীবনের শুভ আরম্ভ করিয়েছে তাও এক প্রকার নিঃসন্দেহেই বলা যায়। আর ওই চিঠির শেষে ছেলেটি আরও একটি অক্ষর লিখেছে, কিন্তু সেটা যে কোন ভাষার কি অক্ষর তা অবশ্য গবেষণা সাপেক্ষ।

যাক্ মাকে সে চিঠির সংবাদ দিতেই, মা সেই চিঠিখানা হাতে নিয়ে বেশ মনোযোগ সহকারে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। কি দেখলেন তা অবশ্য জানা নেই। হয়ত বা সেই মত আবিষ্কৃত অক্ষরটিকেই দ্বিতীয়বার আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মা সে চিঠির উত্তর লেখালেন,—'বন্ধুকে লেখো, তার চিঠি মা দেখেছেন। সুন্দর বন্ধুর হাতের লেখা। বন্ধু যেন খুব ভালো করে লেখাপড়া করে আর মাঝে মাঝে চিঠি দেয়।'

যাক্ মায়ের কাছে ছোটদের লেখা বিভিন্ন ধরণের অজস্র চিঠি থেকে কয়েক খানা তোমাদের উপহার দিলাম, আর সে সঙ্গে দিলাম মায়ের দেওয়া সে সব চিঠির উত্তর-ও। মায়ের দেওয়া উত্তর গুলো তোমাদের কেমন লাগল বল তো? আর বল, প্রথমেই আমি যে বলেছিলাম যে মায়ের কাছে, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, কিশোর-কিশোরী সকলের প্রতি মায়ের সমান স্নেহ ও ভালবাসা, আশা করি—এই সব উত্তর পড়ে তা এখন তোমরাও বুঝতে পারছ। কাজেই বোঝ মা

স্নেহের কি অনন্ত পারাবার যে তিনি সমগ্র বিশ্বের, সকলকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রেখে ছিলেন। তিনি যে মা, বিশ্ববাসীগণ যে তাঁর সন্তান, তাই ওরকম তো হবেই—তাই না?

পূর্বেও তোমাদের জন্যে মায়ের বলা কয়েকটি সুন্দর সুন্দর উপদেশ শুনিয়ে ছিলাম। এবার আরো কয়েকটি তোমাদের বলছি।

তোমাদের প্রতি মায়ের আরো উপদেশ—

১। পিতা-মাতা সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবান কোথায় তুমি তো জানো না—কিন্তু মা বাবা তো প্রত্যক্ষ তোমার সামনে। প্রতিদিন ভোর বেলা উঠে মা বাবাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ চেয়ে নিলে জীবনে অনেক বিপদ আপদ দূর হয়ে যায়।

২। গুরুজন কাকে বলে জানো? গুরুজন মানে শ্রেষ্ঠজন। যাঁরা তোমার চেয়ে সব বিষয়ে বড় তাঁরাই গুরুজন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক, কথা কাটাকাটি করতে নাই। তাঁরা যা কিছু বলেন, তা তো তোমাদের মঙ্গলের জন্যই।

৩। তোমরা বল ভগবানকে তো দেখতে পাই না। তাই বলা হচ্ছে, রাত্রি বেলা বিছানায় শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে, ততক্ষণ ঠাকুরের যে ছবিটি বা মন্দিরের যে বিগ্রহটি তোমার ভাল লাগে, তাঁর কথা চিন্তা করতে হয়। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে অনেক সময় স্বপ্নে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়। এরূপ দর্শনে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ জন্মে—আর তার ফলে ভগবৎ দর্শন সুলভ হয়ে ওঠে।

৪। প্রতিদিন, দু মিনিট হলেও একটা সময় বেঁধে নিতে হয়। ঐ দু মিনিট রোজ নিয়মমত ভগবানের নাম করবে। মনে করবে যে ওই দু মিনিট ভগবানকে দিয়ে দিয়েছি--ও সময় ভগবানের নাম করা ছাড়া অন্য কিছুই করা চলবে না। খেলাও না।

৫। এ শরীরটা কি বলে জানো? এ শরীরটা বলে তোমরা যেমন সবাই মিলে কত রকম খেলা কর না, তেমনি সবাই মিলে ভগবানকে নিয়েও খেলা করবে। কখনো তাঁর নামের খেলা, কখনো তাঁর রূপের খেলা, আবার কখনো তাঁর লীলার খেলা।

৬। মিথ্যা কথা কখনো বলতে নাই। কেন জানো? কারণ মিথ্যা বললে কেউ তাকে ভালবাবে না। আর যাকে কেউ ভালবাসে না, তাকে খুব কষ্ট

পেতে হয়। আর যে কখনো মিথ্যা কথা বলে না, তাকে সবাই কত আদর করে, কত ভালবাসে।

৭। তোমরা সকাল বেলা উঠে প্রার্থনা কর তো? ঘুম থেকে উঠে, বিছানায় বসেই, হাত জোড় করে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে,—'হে ভগবান, তুমি কোথায় থাকো আমি তো জানি না। তুমি যেখানেই থাক, ঠাকুর, তুমি আমাকে ভাল ছেলে বা মেয়ে করে দাও। আজ সারাদিন আমি যেন মিথ্যা কথা না বলি, খুব ভাল হয়ে চলি।

৮। যদি তোমাদের কোন দিন, কোন কারণে কিছু অন্যায় কাজ হয়ে যায়, তবে ভগবানের কাছে সে ত্রুটি স্বীকার করবে। তার জন্য ক্ষমা চাইবে। হাত জোড় করে বলবে,—'ভগবান আমি তোমার অবোধ ছেলে বা মেয়ে; আমি না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ঠাকুর তুমি আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন আর কোন ভুল বা অন্যায় না করি।

৯। লেখাপড়া করাটা তো ছাত্রদের তপস্যা। তপস্যা কি? কষ্ট স্বীকার না করে যা করতে পারা যায় না, তাই তপস্যা। লেখাপড়া না করলে লোকে মূর্খ বলে, আর লেখাপড়া শিখলে সে হয় বিদ্বান। বিদ্বান মানে? বিদ্+আন। যা বিশেষ জ্ঞানকে আনে। অর্থাৎ ভগবান লাভের পথ।

১০। তোমাদের জন্য মার বলা নীতি কবিতা :

সত্য কথা বলবে।
ভগবানে স্মরবে।
পিতামাতা গুরুজন,
তাদের কথা কর পালন।
লেখা পড়া করবে।
যত পার হাসবে।
খেলা ধূলা ছুটোছুটি,
সবাই মিলে করবে জুটি।
ঠিক ঠিক এসব হলে,
হবে ভাল মেয়ে বা ছেলে।

কবিতাটি মুখস্থ করে নিয়ে রোজ তা পালনের চেষ্টা করবে। এগুলো যে মায়ের আদেশ। বুঝেছ তো?

'শোন বলি মায়ের কথা' সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

শ্রীশ্রীমার আনন্দময়ীর অলৌকিক জীবন কাহিনী অনন্ত কৌতূহলের খনি—অপার বিস্ময়ের আকর। এই কাহিনী মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাল বুঝিতে হইলে হৃদয়ের দ্বারা বুঝিতে হয়। ভাষা সেই হৃদয়ের দুয়ার খুলিতে পারে। এ জন্য-ই গ্রন্থকার গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। সহজ-বোধ্য ভাষায় চমৎকার ভাবে এই মহাগ্রন্থ রচিত। মা আনন্দময়ীকে জানিবার বুঝিবার পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ সহায়তা করিবে।.........

—লোক সেবক

প্রসিদ্ধ সাধিকা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কথা কিশোর কিশোরীদের উপযোগী করিয়া পুস্তকখানি বর্ণিত হইয়াছে। মায়ের মুখের গল্প কয়েকটী বড়ই মধুর এবং কিশোর কিশোরীদের পক্ষে সেগুলি যেমন উপভোগ্য তেমন-ই তাহাদের উন্নত জীবন গঠনের পক্ষে সেগুলি সহায়ক। —আনন্দবাজার পত্রিকা

'শোন বলি মায়ের কথা' বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি। লেখার ভঙ্গিটি সাবলীল, বিষয়বস্তুর সঙ্গে লেখকের অনুভূতির স্পর্শ মিলিয়াছে ; উভয় মিলিয়া বইখানি হৃদ্য হইয়া উঠিয়াছে। —শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

বইখানি সুলিখিত। পড়িয়া রসিক সমাজ আনন্দ লাভ করিবেন।......

—শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

আনন্দময়ী মায়ের জীবন কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভক্তিগদগদ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে এই গ্রন্থখানিতে। গ্রন্থখানি কিশোর কিশোরীদের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। —শ্রীকালিদাস রায়

Story of A Mystic—'Sono Bali Mayər Katha.'

......Though mystics tend to clude the biographers due to innate inscrutability of their lives, the present story of Ma Anandamayee written especially for the Juvenile is not at a discount. The author has a rare privilege of knowing her intimately and his sketch is fascinating. It is likely to kindle up the latent Spirituality of the immature.......

--The Free Lance